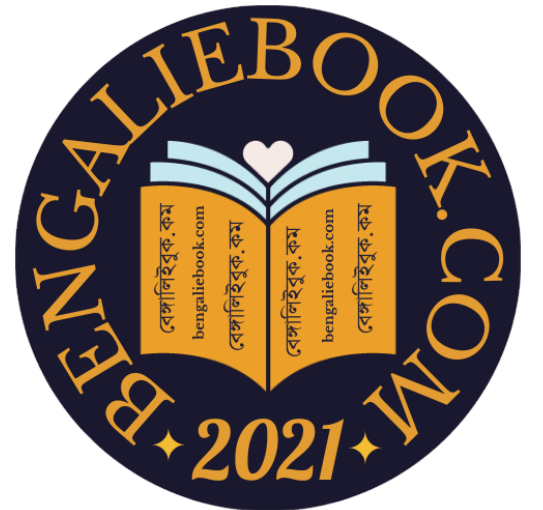


ঈশ্বরী বরিকশনন্দে বর্ণী ও রচনা

ঈশ্বরী-শিক্ষা-সংবাদ

ঈশ্বরী বরিকশনন্দ



সূচিপত্র

১. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১-৫	2
২. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৬-১০	8
৩. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১১-১৫	4 6
৪. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১৬-২০	6 9
৫. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ২১-২৫	9 8
৬. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ২৬-৩০	1 2 4
৭. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৩১-৩৫	1 4 6
৮. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৩৬-৪০	2 0 9
৯. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৪১-৪৬	2 3 4

১. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১-৫

১

স্থান—কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার
কাল—ফেব্রুআরি(শেষ সপ্তাহ), ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন চারিদিন হইল স্বামীজী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়িতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে বেলা প্রায় ২ টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটি ‘শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র’ পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের কাছে তাহার যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্যম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—‘বয়ং তত্ত্বাশ্বেষাদ্ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী’২। কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া গিয়া শিষ্যকে ‘বিবেকচূড়ামণি’র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেনঃ

মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়াঃ
সংসারসিন্ধোসুরণেহস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োহস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥৩

এবং তাহাকে আচার্য শঙ্করের ‘বিবেকচূড়ামণি’ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, ‘মিরর’-৪-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, ‘তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।’ নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে স্বামীজী বললেনঃ

আমেরিকাবাসীর মতো এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসেবাপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি; আমেরিকার লোক এত সহৃদয় বলেই তাঁরা বেদান্তভাব গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ডের কথায় বলিলেনঃ ইংরেজের মতো conservative (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা কিছুতেই তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অন্য কোন জাতিতে মেলে না। সেইজন্য তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারকার্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র ক’রে এসেছি। পরবর্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে।

নরেন্দ্রবাবু। এইরূপ ধর্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?

স্বামীজী। আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্ম-ভাবের স্ফুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হবে—অনেকটা এখনই হয়েছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট ঐহিক জীবনের

বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করে পারমার্থিক কল্যানলাভে সমর্থ হবে। নরেন্দ্রবাবু। এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি?

স্বামীজী। ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুতুলিকার মতো কাজ করছে; আপনারা যদি মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌমিক শক্তি-প্রয়োগ করেই একদিন স্বাধীন হবো, তবে আপনারা নেহাত ভুল বুঝছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের ঐ শক্তি-প্রয়োগকুশলতায় তেমন প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপ বেদান্তোক্ত ধর্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করে, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে ধর্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার করে ওদের—‘এ দেও, ও দেও’ বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেষ্টামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে।

আমরা বিশ্বাস—এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ(secondary) উপায় বলে বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ করে যান।

নরেন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্তির দিকে অনিমেঘ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো—মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা, দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমন-বার্তা পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে

আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেনঃ

স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়া হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হণ।

স্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়াপরাবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য নির্বাহ হয়।

স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক। মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সংকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেন্ট নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি?

প্রচারক। না। লোকের কর্মফলে-পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেনঃ

যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না নিজের ভাইঅনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষিরক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে

কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক। (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) হাঁ গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করিবেন?

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রুপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না) স্বামীজীকে বলিলেন যে, সেই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী। আমি তো সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো, যাতে আপনাদের সাহায্য করব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মানুষের সেবায় ব্যয় করব; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে- অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব করে যদি অর্থ বাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেনঃ

কি কথা বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তাদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তাদের কি আবার মানুষ?

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল। পরে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

আবার আমার সঙ্গে দেখা করো।

শিষ্য। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়তো কোন বড় মানুষের বাড়িতে থাকিবেন। আমাকে তথায় যাইতে দিবে তো?

স্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাজার মঠে, কখন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে থাকব। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব বেদান্তের কথা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্তার রুষ্ট হইবে না তো?

স্বামীজী। তারাও সব মানুষ-বিশেষতঃ বেদান্তধর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুশী হবে।

শিষ্য। মহাশয়, বেদান্ত অধিকারীর যে-সব লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে বলে—অতীতবেদ-বেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধনসম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় না। আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া? স্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা ‘বিবেক-চূড়ামণি’ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দরজীপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

১ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ

২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—কালিদাস

৩ ‘হে বিদ্বন্! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই, সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই পথ আমি তোমায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি।’

৪ ‘Indian Mirror’ পত্রিকা

৫ অসুর, দেহাত্মবাদী, ভোগবাদী-দ্রষ্টব্যঃ ছান্দোগ্য উপ, ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ

২. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৬-১০

৫

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার

কাল—মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, ‘চল্, আমার সঙ্গে যাবি’। বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্যের সঙ্গে উঠিলেন; গাড়ী দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য॥ মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী॥ চল্ না, দেখবি এখন।

ঐরূপে কোথায় যাইতেছেন সে বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ী বিডন স্ট্রীটে উপস্থিত হইলে—কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, ‘তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস?’

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল-কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম.এ, বি.এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী॥ ও তো বিলাতী ঢঙে হচ্ছে। তোদের ধর্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর! গবর্ণমেন্টের statistic-এ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one

per cent (শতকরা একজন)-ও হবে না, তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দশা হয়? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এ-সব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? তোরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখেছিস—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভেতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার যো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গায়ে গায়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে; কালে যাতে তারা ভাল গিনী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, ‘চোরবাগানের রাস্তায় চল্।’ গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, ‘মহাকালী পাঠশালা’র স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই-চারিজন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রমাণ করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ ‘শিবের ধ্যান’ সুর

করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ পরে তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিলেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে মাতাজী একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং ‘রঘুবংশে’র তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, ‘আমি ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।’

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুল সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় (Visitors’ Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে—‘The movement is in the right direction’ (স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে)।

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেনঃ

স্বামীজী॥ ঐর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! সর্বস্ব-ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গার্গী খনা লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই?

স্বামীজী॥ দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নেই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চম্ফু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তারা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইতে পারিলে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত। স্বামীজী॥ ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো করে চৈঁচাতে লাগল ‘আমরা আইন চাই না’। অন্য দেশ হলে সভা করে চৈঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাকত ও ভাবত আমাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী॥ কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য॥ এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী॥ অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন করে? লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সে- মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তাদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক স্থানে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী॥ ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা-আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।

শিষ্য॥ মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজী॥ ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখান উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়।

মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

গাড়ী এইবার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহার তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে ‘রামকৃষ্ণ মিশনের’ সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় (এ ছাড়া অন্য পথ নেই)। শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, ‘যেন পেছাদের দলে যাসনি।’ ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, ‘শুনিসনি? ক-অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভেতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।’ সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্তনেস্ত না হলে তো আর শান্তি নেই। এখন যা হচ্ছে, তাই হবে।’

৬

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার

কাল—(মার্চ?), ১৮৯৭

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ম্যাক্সমুলার (Max Muller)-এর মুদ্রিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড় লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে

পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী সন্নেহে তাহাকে কখনও কখনও ‘বাঙাল’ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাক্সমুলার-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

মনে হল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমুলার-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমুলারকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে! বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ—অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার করছে!—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়ছিল!

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি ম্যাক্সমুলার হইয়া থাকেন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী॥ অজ্ঞান থেকেই মানুষ ‘আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ’ ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি?—তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি?—East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) এই ঋণেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে, এ যুগে কেউ কি কখনও দেখেছে? ম্যাক্সমুলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল

manuscript (পাণ্ডুলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝা; সাথে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার ‘বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে’—সায়নের এই মত স্বামীজী সর্বথা সমর্থন করিয়া বলিলেনঃ

‘বেদ’ মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মত সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদ ‘ঋষি’ শব্দের অর্থ মন্ত্যার্থ-দ্রষ্টা—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। ‘শব্দ’ পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পূর্ণ থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও একরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্বেই আছে ‘সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।’ বুঝলি?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিষ না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈরী হইবে?

স্বামীজী॥ আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝা—এই ঘটটা ভেঙে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐসকল জিনিষের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিষগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত ঐ

পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকৃতস্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ ‘ওঁ’কার আপনা-আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী॥ জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘট-শব্দ থাকতে যে পারে, তা তো বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিষগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙেচুরে গেলেও তত্ত্বদোষাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ‘ঘট’ ‘ঘট’ বলিয়া চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী হয় না।

স্বামীজী॥ তুই আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন-ঘটন হতে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে ‘ওঁ’কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ’ বা ‘গো মানব ঘট পট’ ইত্যাদি ঐ ‘ওঁ’কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক-একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিষগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য॥ হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না। স্বামীজী॥ ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর ‘ওঁ’কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়—তারপর তাও শুনা যায় না। তাও আছে কি নেই—এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা-শুনা জিনিষ না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন ‘আমি-আমার’ রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে ‘ওঁ’কার অনুভব করেন ‘ওঁ’কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—‘ক্ষীরে নীরবৎ।’

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। ‘শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়’ ১৪ এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু Terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—‘কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেঁট-বিঁটু নিয়েই দিন কাটালে।’

গিরিশবাবু॥ কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে, ওতে সঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের

দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।

এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—‘জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।’

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, ‘হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অনাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী, এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলদ্বীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্ছোরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?’ গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!’

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু॥ জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য॥ আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান্ কিনা! কিন্তু এই সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু॥ বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথক্‌ত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দেখ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না ‘সৎ-চিৎ-আনন্দ’ তিনটে একই জিনিষ? এই দেখ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদবেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই তো গিরিশবাবু সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘কি রে তোদের কি কথা হচ্ছিল?’

শিষ্য॥ এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

স্বামীজী॥ গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশবাবু) মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনও ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য॥ আজে হাঁ।

স্বামীজী॥ আজে হাঁ নয়। যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মত সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই

সব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?

শিষ্য॥ হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, কি হবে ও-সব পড়ে? আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?

স্বামীজী॥ আমাদের উভয়ের কথাই সত্য। তবে দুই standpoint (দিক্) থেকে আমাদের দু- জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চূপ হয়ে যায় ‘মূকাস্বাদনবৎ’। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তাকে এসব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, ‘মহাশয়, শুনিলেন তো স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।’

গিরিশবাবু॥ তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, ‘ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?’

সদানন্দ॥ মহারাজ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী॥ প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ॥ যো হুকুম মহারাজ!

স্বামীজী॥ জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—‘মুক্তিঃ করফলায়তে।’

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু॥ তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

৭

স্থান—আলমবাজার মঠ, কলিকাতা

কাল—এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী যখন কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিষয় সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, বহুজনহিতকর, বহুজনসুখকর কোন ঐহিক কার্যের অনুষ্ঠান এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কৃপা করিতেন। এই সময় কতিপয় ভাগ্যবান্ যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে চারিজনকে ১৫ স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল।

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, সেজন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ-বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।’ স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ কৃপাগুণে তাহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘তুই তো ভট্‌ চাষ বামুন; আগামী কাল তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ১৬ করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দিবি। আজ পাঁজি-পুঁথি সব পড়ে শুনে দেখে নিস।’ শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল।

শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া পিণ্ডাদি লইয়া গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘এ-সব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?’ শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের মত অবস্থান করবে। ন ধননে ন চেজ্যয়া ... ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।১৭

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল, শাস্ত্রজ্ঞানের আশ্চর্যজনক দূরীভূত হইল।

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেনঃ

তোমরা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছে; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—‘কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।’

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম-বিষয়েই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, ‘একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে।’ ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।’ গীতাতেও আছে—‘কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।’ ১৮

সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাপ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নইলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যে যতই বলুক না কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামীজী॥ সিদ্ধ হয় কিনা হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস, ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য॥ মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী॥ সন্ন্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’—যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে। ১৯ যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

যুবেব ধর্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।

কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবাকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়—বিদ্বৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সন্ন্যাস, মর্কট সন্ন্যাস এবং আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল, তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। এরই নাম ‘বিদ্বৎ সন্ন্যাস’। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগল—একে ‘বিবিদিষা সন্ন্যাস’ বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম ‘মর্কট সন্ন্যাস’। ঠাকুর যেমন বলতেন, বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে। আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী ‘আতুর সন্ন্যাস’ দিয়েছিলেন। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী॥ সুকৃতিবশতঃ কোন-না-কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও দু-একজন মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে ‘নাগ-মহাশয়’।

শিষ্য॥ মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী॥ পাগলের মত কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর থেকেই

ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজী॥ তা কে বললে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' ২০ বলে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছি—এ-সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে রাঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান্ বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, 'বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।'

স্বামীজী॥ মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান্ বুদ্ধ তার ঢের আগে।

রামকৃষ্ণানন্দ। তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্মের আলোচনা দেখা যায় না, তখন তুমি কি করে বলবে—বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী॥ History (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পারি, হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ॥ আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজী॥ ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। History-কে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান্ বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। (পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।)

সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে এই ত্যাগব্রত অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস-গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য॥ মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইঁহারা বলেন, সন্ন্যাসীরা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক হন না।

স্বামীজী॥ লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল দেখি। শিষ্য॥ পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোষাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী॥ মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এ-সব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো-তমো-ঘোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভেতরই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে; এরাই ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাদের অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিন আমেরিকার Red Indian-দের (আদিম অধিবাসীদের) মত প্রায় extinct (উজাড়) হয়ে যেত। গৃহীরা সন্ন্যাসীদের

দুমুঠো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শসকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাবগুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। দেশের লোকের সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদেই বর্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী॥ হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোক চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই তো তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হস তো তাদের ধিক—শত ধিক।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্তিমান্ ‘সন্ন্যাস’রূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্মুখ হইয়া আপনা-আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেনঃ

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেন চ তুষ্টিমন্তঃ।

অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥২১

পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায় ‘বৃথৈব তস্য জীবনম্।’ পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগণভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’

৮

স্থান—আলমবাজার মঠ
কাল—মে, ১৮৯৭

দার্জিলিঙ হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য স্বামীজীকে দার্জিলিঙে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, নাগ-মশায়ের আপত্তি না হলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব।

১৩০৩ সালের ১৯ বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজে আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, আজ তোকে ‘বলি’ দিতে হবে—না?

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এ-সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেনঃ ‘আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি তো? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তা হলে তাও নির্বিচারে করতে পারবি তো? এখনও ভেবে দেখ; নতুবা সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগোসনি।’—এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে ‘পারিব’ বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনিষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যরা ‘সমিৎপাণি’ হয়ে গুরুর আশ্রমে যেত। গুরু—অধিকারী বলে বুঝলে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন ঐটে বেঁধে রাখত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য॥ তবে কি, মহাশয়, আমাদের মত সূতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজী॥ বেদে কোথাও সূতোর পৈতের কথা নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনও লিখেছেন, ‘অস্মিন্বেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।’ সূতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে ‘উপনয়ন’ বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই

তো তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগ-রূপ মন্ত্বে দীক্ষাগ্রহণ করে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস দান কর। শাস্ত্রে বলে—যাঁরা অধীত বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—‘নাত্র কার্যবিচারণা।’ এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস—‘অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ।’ ২২

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না গিয়া ঘরেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ‘বাবা, আয়’ বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সন্মুখে আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘দোরে থিল দে।’ সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, ‘স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বস।’ স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে দূরদূর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্বহন্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেঘনয়নে শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ... কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, ‘গুরুদক্ষিণা দে।’ শিষ্য বলিল, ‘কি দিব?’ শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, ‘যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।’ শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু

লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেগুলি সব খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ‘যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।’

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের ২৩ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বামীজীও তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল?’

স্বামীজী॥ বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত ‘আমি-তুমি’ ভাব—যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম-দ্বন্দ্বভাব এসেছে, কমে যায়। ‘আমা থেকে অমুক ভিন্ন’—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না—‘তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।’ ২৪

যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায়—weakness is sin. এই দুর্বলতা থেকেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্মা সর্বদা জ্বলজ্বল করছে, সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিস্তৃতকিমাকার খাঁচা—এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে ‘আমি আমি’ করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান।

শিষ্য॥ তাহা হইলে এই সকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে?

স্বামীজী॥ যতক্ষণ ‘আমি’ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই ‘আমি আত্মা’—এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে ‘পাপ পাপ’ বলে, সেটা weakness (দুর্বলতা)-এর ফলে—‘আমি দেহ’ এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন ‘আমি আত্মা’—এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, ‘আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।’

শিষ্য॥ মহাশয়, ‘আমি’-টা যে মরিয়াও মরে না! এইটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী॥ এক ভাবে খুব কঠিন, আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। ‘আমি’ জিনিষটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিষটে নেই, তাকে নিয়ে আবার মারামারি কি? আমিত্ব-রূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (সম্মোহিত) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সকলের মধ্যে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন—এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য নিজের প্রভায় নিজে জ্বলছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিষটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছু সহজে কি করে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, ‘বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।’^{২৫} তুই যা কিছু জানছিস, তা মন-রূপ কারণসহায়ে। মন তো জড়; তার পিছনে শুদ্ধ আত্মা থাকতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধতার নিকট পৌঁছাতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছাতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্যন্ত। তারপর মন যখন বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর ‘অপরোক্ষানুভূতি’ বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো ‘আমি’। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে ‘আমি’টাও তো আর থাকিবে না।

স্বামীজী॥ তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ ‘আমিত্বে’র স্বরূপ। তখন যে ‘আমি’টা থাকবে, সেটা সর্বভূতস্থ, সর্বগ—সর্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ—ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ ‘আমি’ বা আত্মার কি?

যা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—‘কালেনাত্মনি বিন্দ্ভতি।’ ২৬ শ্রবণ-মনন করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে, আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আন্তে আন্তে ধূম পান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেনঃ

এ সহজ বিষয়টা বুঝতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না! আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষ-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!!

৯

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার
কাল—মে (১ম সপ্তাহ), ১৮৯৭

স্বামীজী কয়েক দিন বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় (১ মে) ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাটীতে সমবেত হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বৈষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-যত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহায় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে,

তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কাজ চালাতে পারবে। সেই জন্য এই সঙ্ঘ একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কাজ করা হবে।

আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাত্মকে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নামা রাখা হইল—‘রামকৃষ্ণ-প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন।’ উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।২৭

উদ্দেশ্যঃ মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই ‘প্রচারের’ (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রতঃ জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই ‘প্রচারের’ (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালীঃ মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্যঃ ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগঃ ভারত-বহির্ভূত প্রদেশসমূহে ‘ব্রতধারী’ প্রেরণ এবং তত্ত্বৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম-সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর বলরাম বাবুর বাটীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত ‘রামকৃষ্ণ মিশন’-সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ‘এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।’

স্বামী যোগানন্দ॥ তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?

স্বামীজী॥ তুই কি করে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডীতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডী ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কখনও উপদেশ দেননি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী প্রতিবাদ না করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছে—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, দেখবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামী যোগানন্দ॥ তুমি যা ইচ্ছা করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ-সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যান্যরূপ দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্যান্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

স্বামীজী॥ কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করচ্ছেন, তা আমি কি করব—বল্?

এই বলিয়া স্বামীজী কার্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, ‘আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত তো ধন্য হতুম।’

শিষ্য॥ মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ॥ তিনি বলতেন, ‘এমন আধার এ যুগে জগতে আর আসেনি।’ কখনও বলতেন, ‘নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি; নরেন আমার স্বশুরঘর।’ কখনও বলতেন,

‘অখণ্ডের থাকা।’ কখনও বলতেন, ‘অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবীসকলও ব্রহ্ম হতে নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।’ কখনও বলতেন, ‘জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ-নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।’ কখনও বলতেন, ‘শুকদেবের মত তাকে মায়া স্পর্শ করতে পারেনি।’

শিষ্য॥ ঐ কথাগুলি কি সত্য, না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরত না।

শিষ্য॥ তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ॥ তুই বুঝতে পারিসনি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়াবাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, ‘তোদের ওদেশে ২৮ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে লোকে জানে কি?’

শিষ্য॥ মহাশয়, এক নাগ-মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে! কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরবতার, এ কথা ওদেশের লোকেরা এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

স্বামীজী॥ ও-কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারংবার শুনলুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা!

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পার ‘আমি ভগবান্’, তবে বিশ্বাস করব—তুমি সত্যসত্যই ভগবান্। তখন শরীর যাবার দু-দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।’ আমি শুনে আবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হল না—সন্দেহে, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—তা অপরের কথা আর কি বলব? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ-সব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তুপস্বরূপ। ঐর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুরাবাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে কত কি দেখিয়াছিলেন! তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল।

স্বামীজী॥ যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না; মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হল, দুর্যোধন ভেক্‌বিবাজী ভাবলে। তিনি না বুঝলে কিছু বলবার বা বুঝবার যো নেই। না দেখে না শুনে কারও ষোল-আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য॥ কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ হাঁও বটে, নাও বটে।

শিষ্য॥ কিরূপ?

স্বামীজী॥ যারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান্ প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন— ঠাকুর যেমন বলতেন, ‘তাঁর বালকের স্বভাব’; সেজন্য দেখা যায়—কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না; আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভেতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে ভগবান্ অযাচিত কৃপা করে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, ‘তাঁর প্রতি নির্ভর কর—ঝড়ের ঐটো পাতা হয়ে যা’; আবার কখনও বলতেন, ‘তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।’

শিষ্য॥ মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজী॥ যুক্তিতর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডীর মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)-ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন—আবার সে-সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে সেই মূহূর্তে beyond law (নিয়মের গণ্ডীর বাইরে) চলে যায়। সেজন্য কৃপার কোন condition (বাঁধাধরা নিয়ম) নেই; কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ সৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল—‘লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্’। ২৯ যিনি খেয়াল করে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা করে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না? তবে যে কারুকে সাধন-ভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য॥ মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামীজী॥ বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস তাঁতে মন লাগিয়ে থাক। তা হলেই এই জগৎভেঙ্কি আপনি-আপনি ভেঙে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎ বিচার করতে হবে, ‘আমি দেহ নই’—এইরূপ বিদেহ-ভাবে অবস্থান করতে হবে, ‘আমি সর্বগ আত্মা’—এইটি অনুভব করতে হবে।

এরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পরমপুরুষার্থ।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এখানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, ‘যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আসবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক বা যাই করুক না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।’ তোর কথাই ভেবে দেখ না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক বুঝেছেন, সেই নাগ-মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? ‘অনেক- জন্মসংসিদ্ধান্ততো যাতি পরাং গতিম্’ ৩০ —জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ-মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে ‘তৃণাদপি সুনীচেন’, ৩১ তা একমাত্র নাগ-মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙাল দেশ ধন্য, নাগ-মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

জি.সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল?

গিরিশবাবু॥ আমি আর কি বলব? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।

স্বামীজী॥ আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কাজ করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide (পরিচালনা)

করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না!

গিরিশবাবু॥ তিনি বলেছিলেন, ‘সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে?’

এইরূপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশবাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি—ঐরূপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্ব স্বরূপের দর্শন হয়, সে যে কে—এ-কথা যদি জানতে পারে, তবে আর এক মুহূর্তও তার দেহ থাকবে না।’ তাই দেখিয়াছি, সর্বদা ঠাকুরের কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই মতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

১০

স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার

কাল—জানুয়ারী, ১৮৯৮

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র—তিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্যগ্রহণ—সর্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্বিদগণও গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজীকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজে সে বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘তোদের দেশের মত রান্না করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।’

বলরাম বাবুদের বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতরে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীন-মা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা ‘দেখিস মাছের ‘জুল’ যেন ঠিক বাঙালিধিশি ধরনে হয়’ বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, মুগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তনি রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা করিয়া খাইতে বসিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকী আছে বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মত বলিলেন, ‘যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছি নে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।’ শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের সুক্তনি ও ভাত দিয়া গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজীকে অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী-মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু তিনি সেই সুক্তনি খাইয়া খুশী হইয়া বলিলেন, ‘এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের ‘জুল’টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।’ টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘এটা ঠিক যেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে।’ অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর

উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, ‘যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।’

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দো।’ এই বলিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, ‘এই পুণ্যক্ষেণে গুরুপদসেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।’ এই ভাবিয়া শিষ্য শান্তমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্বগ্রাস৩২ হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মত তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি তাই কোটিগুণে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে সুনিদ্রা দেননি, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি তো এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।’

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতঃপূর্বে কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দূরদূর করিতে লাগিল; কিন্তু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিষ্য উঠিয়া ‘পরাক্ষি খানি ব্যত্‌গৎ স্বয়ম্ভূঃ’ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে ‘গুরুভক্তি’ ও ‘ত্যাগে’র মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, ‘আহা! সুন্দর বলেছে।’

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী) প্রভৃতি শিষ্যকে স্বামীজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় ‘ধ্যান’ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকী আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, ‘তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।’

শুদ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?’

স্বামীজী॥ কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

শিষ্য॥ শাস্ত্রে যে সবিসয় ও নির্বিসয়-ভেদ দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি?—
এবং উহার মধ্যে কোন্টি বড়?

স্বামীজী॥ প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেত, কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! যাক এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্তন ও প্রচার করে গেছেন। তারপর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, এ-কথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার যো নেই।

শিষ্য॥ মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজী॥ বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, তখন শুদ্ধ ‘অস্তি’ এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজী॥ ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখন ‘মার’-এর অভ্যুদয় হল। ‘মার’ বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাকসংস্কারই ছায়ারূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য॥ তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামীজী॥ তা নয় তো কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নেই। এই যে জগৎ দেখছিস, এটাও নেই। সকলই মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস দর্শন হয়, তখন ‘যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি’—সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে এবং কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ করে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি (সিদ্ধাই) লাভ করে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ ‘শিব’ ‘শিব’ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, ‘ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নয়। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, এ-ই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। ‘সর্বং বস্তু ভয়াশ্রিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।’

৩. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১১-১৫

১১

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাটী, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া
কাল—৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮-(মাঘীপূর্ণিমা)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। নবগোপাল বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। স্বামীজীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষে উৎসব। ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাটীখানা আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাটীতে যাইবেন, সেই পথের দুই-ধারে অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী ‘দুখানি ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে! কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরঘরে!’ গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্যম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। লোকে যখন দেখিল, স্বামীজী অন্যান্য সাধুগণের মত সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, ‘ইনিই

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ! স্বামীজীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল; ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপাল বাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সান্নিধ্যপাঙ্গণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ‘জয় রাম, জয় রাম’ বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্মরপ্রস্তুত মণ্ডিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোর্বিলেনের মূর্তি। ঠাকুরপূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্কে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ। আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।’

স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি; সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম, যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন?’ সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষণ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের মত পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেনঃ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে শিষ্যও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়ীতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পৌঁছিয়া নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

১২

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন। ৩৪ আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিষপত্র এখনও সব গুছান হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুশী হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, ‘দেখ্ দেখি কেমন গঙ্গা, কেমন বাড়ী! এমন স্থানে মঠ না হলে কি ভাল লাগে?’ তখন অপরাহ্ন।

সন্কার পর শিষ্য স্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর

বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ ‘অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলাম, নইলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে?’

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধুলা ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন; বলিলেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া তিনি বাড়ীঘর ভুলিয়া যাইতেন এবং রাত হইয়াছে বা বাড়ী যাইতে হইবে ইত্যাদি কোন বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রি রামায়ণগান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ীর নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত হনুমানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেন।

ছাত্রজীবনে দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। কখন যে তিনি পড়াশুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

শিষ্য॥ মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখনও কোনরূপ vision দেখিতেন (আপনার দিব্যদর্শন হইত) কি?

স্বামীজী॥ স্কুলে পড়িবার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হল, তখনও বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী-মূর্তি—মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন আমায় কিছু বললেন—এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পরে মনে হল,

কেন এমন নির্বোধের মত ভয়ে পালালুম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্তির কখনও দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে—যদি ফের তাঁর দেখা পাই তো এবার আর ভয় করব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর তাঁর দেখা পাইনি।

শিষ্য॥ তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি?

স্বামীজী॥ ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাইনি। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেনঃ মন শুদ্ধ হলে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত অদ্ভুত! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐ-সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনিসনি, ঠাকুর বলতেন—‘কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে!’ আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হবে—ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে?

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

দেখ, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেশী লেকচার দিতে হত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহা ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগল। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, তাইতো এখন কি উপায় করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনিনি,

ভাবিওনি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ করে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শূয়ে শূয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখনও বা এত জোরে জোরে তা হত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত—‘স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কইছিলেন?’ আমি তাদের সে-কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ‘মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূলদেহে কখনও কখনও তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।’

শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘তা হবো।’

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমায় অত খাতির করত। পুরুষগুলো দিনরাত খাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করে মহা বিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিস্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজী॥ হয়েছিল বৈকি। লোকে যখন আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল! কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না; তাই ঐ-সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাইত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ-সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ

ভাঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস বাবা, সংসার সবই দুনিয়াদারি! ঠিক সংসাহসী ও জ্ঞানী কি এ-সব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস না?—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমন্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাং পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥৩৫

লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষ পরে তোর দেহপাত হোক, ন্যায্যপথ থেকে যেন ভ্রষ্ট হসনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যার ভীরা কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃকপাত করে রে? যা হবার হোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবই করব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

শিষ্য॥ তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজী॥ শাস্ত্র নির্ভরতাকে ‘পঞ্চম পুরুষার্থ’ বলে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে ‘দৈব দৈব’ করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহা-কাপুরুষতার পরিণাম, কিন্তুতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যা-পাপের গল্প শুনেছিস তো? সেই গোহত্যা-পাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হল। আজকাল সকলেই ‘যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’ বলে পাপ-পুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রে জল! সর্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে তো মুক্ত! কিন্তু ভাল-র বেলা ‘আমি’, আর মন্দের বেলা ‘তুমি’—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতা! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে

নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের) ভেতর ইদানীং নাগ-মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ-মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটি দেখা যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!

শিষ্য॥ তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাকরুন (নাগ-মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজী॥ ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা যায় না। তাঁর সঙ্গে খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য॥ মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজী॥ অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে ঐরকম মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ-মহাশয় বাড়ীতে কিরূপ থাকেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, কাজকর্ম তো কিছুই দেখি না। কেবল অতিথিসেবা লইয়াই আছেন; পালবাবুরা যে কয়েকটি টাকা দেন, তাহা ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হয় তেমনি! নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা, সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের শরীরটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁশ। বাস্তবিক শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (অতিচেতন) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্বদা সেই অবস্থায় থাকেন।

স্বামীজী॥ তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তাদের বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

১৩

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

কাল—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সে-বার ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজাও হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

জন্মতিথিপূজায় সে-বার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘পৈতে এনেছিস তো?’

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী॥ দ্বি-জাতিমাত্রেরই ৩৭ উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী॥ ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রই পরস্পর পরস্পরের ভাই। ‘ছোঁব না, ছোঁব না’ বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্থতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—‘তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।’ বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে

স্বামীজী॥ এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পরবে। স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া অসিয়া, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থূল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাথে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল।

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া ‘কৃজন্তং রামরামেতি’ স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল ‘রাম রাম শ্রীরাম রাম’ এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। ‘রাম রাম শ্রীরাম রাম’ ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

রামনামকীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন — ‘সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাষ্ট্র।’ স্বামী সারদানন্দও ‘একরূপ-অরূপনাম-বরণ’ গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন:

পরমহংসদেব বলতেন, ‘ইনি ভৈরবের অবতার।’ আমাদের সঙ্গে ঐর কোন প্রভেদ নেই।

গিরিশবাবু নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যে রূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরান হইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন, ‘জি. সি., তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বস।’

গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোন কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্শ্বদগণের আনন্দ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, ‘দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি!’ কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দী গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী नीचे বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

তোরা হচ্ছিস দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ একশত বার জপবি, বুঝলি?

গৃহস্থটি ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন। স্বামীজী॥ মাষ্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শোনাতে হবে।

মাষ্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটি পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পান্তুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে স্বামীজী বলিলেন, ‘ঠাকুরঘরে নিয়ে যা।’

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

দেখছিস কেমন কর্মবীর! ভয় মৃত্যু—এ-সবের জ্ঞান নেই; এক রোখে কর্ম করে যাচ্ছে ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’।

শিষ্য॥ মহাশয়, কত তপস্যার বলে তাঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

স্বামীজী॥ তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্মযোগীরা কর্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল—চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজী॥ তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান্ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্মও সেরূপ। সুতরাং যারা পরহিতে কাজ করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে যা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস— কর্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, পূর্বে ‘তপস্যা’ অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী॥ যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝলি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ না, তপস্যার ফল লাভ হয় কিনা। পরার্থে কর্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী॥ নিজহিতের জন্য। এই দেহটা—যাতে ‘আমি’ অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিহুটাকেও ভুলে যেতে হয়। অস্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এক্রূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘণ্টে বিরাজমান—এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে

সাক্ষাৎকার হইবে? স্বামীজী॥ আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার—সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে ঐ কর্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে সর্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য॥ তাহা না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে যাকে ‘সমাধি’ বলা হয়েছে, সে অবস্থা তো আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল? সে-জন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থানাভের পর সাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য॥ তবেই তো এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা ‘কর্মযোগ’ বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেনঃ

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।

কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥

মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,

হৃদয়-সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি ‘পরে॥

ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,

তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।

ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,

বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥৩৯

গিরিশবাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। ‘তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে’—পদটি বারবার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর ‘মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে’ ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

১৪

স্থান—কলিকাতা, বলরামবাবুর বাটী

কাল—মার্চ (?) ১৮৯৮

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেনঃ

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।

যব্ গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ

করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা বড় এবং উহা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, ‘মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

স্বামীজী॥ Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেননি, কেবল সেটা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়ে আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল।

স্বামীজী॥ সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংঘমেই লাভ করা যায়। (শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া) তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।

শিষ্য॥ তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী॥ কেন? পরের মনের ভাব জানতে পারবি।

শিষ্য॥ তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী॥ কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য॥ তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী॥ আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম—গ্রামের কোন লোকের উপর ‘দেবতার ভর’ হয়েছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয্যে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহু লোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়াচুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, এরই উপর ‘দেবতার ভর’ হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগান হচ্ছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোন অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ইতোমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে আমার কাছে এসে বলল, ‘মহারাজ, আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।’ আমি তো ভেবে অস্থির! কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল। যেই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরী-মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেঁষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার

কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, এই ব্যাপারে কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না বলে চিন্তায় ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হল না দেখে কেবল মনে হতে লাগল, ‘There are more things in heaven and earth ... than are dreamt of in your philosophy!’^{৪০}

শিষ্য॥ পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম। অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন; বলতেন, ‘ঐ-সকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছান যায় না।’ কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজবুজি দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিষ, ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে-জন্য দেখিসনি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, ‘তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুড়ের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা বাঙালকে বল না।’

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্য জেদ করিয়া বসিলে অগত্যা স্বামীজী ঐ কথা এইরূপে বলিলেনঃ

মান্দ্রাজে যখন মন্মথবাবুর^{৪১} বাড়ীতে ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম—মা^{৪২} মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়ীতে লেখা তো দূরের কথা। মন্মথবাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় ‘তার’ করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মায়ে শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবনের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব খবর

বলে দিতে পারে। মন্মথবাবুর অনুরোধেও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথবাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলের করে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শূঁটকো ভূষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ ‘কিড়িং মিড়িং’ করে মান্দ্রাজী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে—উনিই পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই আনলে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেন্সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়ল। তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে! ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা ‘কাকতালীয়ে’র ন্যায়ই হোক, বা যাই হোক। যোগানন্দ॥ তুমি পূর্বে এ-সব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐ-সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল!

স্বামীজী॥ আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেঙ্কির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেঙ্কিই না দেখলুম। মায়্যা-মায়্যা!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর যে দিনরাত জানতে-অজান্তে বলে, ‘আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা’, সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

এই-সব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর

কিছুই নেই। আর সবই মায়া-ভেক্‌বিবাজি! এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য—এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। ‘একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।’

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘কাল আসবি তো?’

শিষ্য॥ আজ্ঞে আসিব বৈকি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে থাকে।

স্বামীজী॥ তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে।

১৫

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা

কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

হইল স্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, ‘কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, শুদ্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।’

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, ‘এসেছিস বাবা, বস্’—এই পর্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রের ভিতরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?’ ‘ও কিছু না’ বলিয়া স্বামীজী পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরেও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না,

তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, ‘ও অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন না?’ পাদস্পর্শে স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল; বলিলেন, ‘অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।’ শিষ্য শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

স্বামীজী॥ ও অমরনাথ ও পরে ওক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেনঃ

অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ে একটা খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হল, ঐ পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কনকনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।

শিষ্য॥ শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে ও অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়; কথাটা কি সত্য?

স্বামীজী॥ হ্যাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য॥ পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজী॥ হ্যাঁ, ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছিলাম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শিষ্য॥ মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি—গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি কেহ সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় তাহার সত্যসত্য শিবদর্শন হইল।

স্বামীজী॥ শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, আসিবার কাল তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্ক্রীভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাতদিন তথায় অবস্থান করিয়া স্ক্রীভবানী দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। প্রতিদিন এক মণ দুধের স্ক্রীভবানী ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিল:

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছু করিল না। হয়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, ‘আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা—আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? তোকে আমি রক্ষা করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?’

স্বামীজী বলিলেন, ‘ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফাট করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়েৰ যা ইচ্ছা তাই হবে।’

শিষ্য অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, ‘যা কিছু দেখিস শুনিস তা তোর ভেতরে অবস্থিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নেই।’ শিষ্য স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, ‘মহাশয়, আপনি তো বলিতেন—এই-সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র।’

স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ‘তা ভেতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মত ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হলে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—তেমনি।’

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল; কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তিতর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, ‘মহাশয়, এই যে ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শোনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে? স্বামীজী॥ সত্য বৈকি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে! তুই দেখতে পাস না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে ঐসব ভূতুরে কাণ্ডে মন দিসনে, ভাববি ভূতপ্রেত আছে তো আছে। তোর কাজ হচ্ছে—এই শরীর-মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনে হয়—উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না। স্বামীজী॥ তোরা তো মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখনও দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসার-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখনও কখনও দূর-দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন—তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থে যাইয়া ‘সে মুক্ত হয়ে যাক’—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কিনা, এই প্রশ্ন করিলে স্বামীজী কহিলেন, ‘উহা কিছু অসম্ভব নয়।’ শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে স্বামীজী কহিলেন, ‘তোকে একদিন ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন বুঝিয়ে দেব।’ শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

৪. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ১৬-২০

১৬

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা

কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

বেলুড়ে নীলাশ্বরবাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। ‘আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ’ ৪৩ ইত্যাদি শ্লোক-দুইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী ‘ওঁ হ্রীং খাতং’ ইত্যাদি স্তবটি রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, ‘দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।’

শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

স্বামীজী যে দিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরুঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও সে কখনও শোনে নাই।

শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, ‘দেখ, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্থলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে-শুনে দিতে।’

শিষ্য॥ মহাশয়, ও-সব স্থলন নয়—উহা আর্থ প্রয়োগ।

স্বামীজী॥ তুই তো বললি, কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন ‘হিন্দুধর্ম কি?’ বলে একটা বাঙলায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মত ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে

যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমানে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তারিত প্রতিবাদও করেছে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি? এখন এ-সব সন্ন্যাসীদের দূরদূরান্তরে প্রচারকার্যে যেতে হবে—ছাইমাথা অর্ধ-উলঙ্গ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম তো জাহাজেই নেবে না; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পৌঁছলেও তাকে কারাগারে থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) করে নিতে হয়। এরপর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verb (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর দিকি। ‘উদ্বোধনে’ ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি। ৪৪ ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্যই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তাদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহা! চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব?

স্বামীজী॥ তুই যদি পুরানো চালটা খারাপ বুঝে থাকিস তো যেমন বললুম নূতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেখি আরও দশজনে তাই করবে; তাদের দেখে আরও ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভেতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস, তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য॥ আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়, উৎসাহ বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজী॥ হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা ‘মানুষ’ যদি তৈরী হয়, তো লাখ বক্তৃত্তার ফল হবে। মন মুখ এক করে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন ‘ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।’ সব দিকে practical (কাজের লোক) হতে হবে। থিওরীতে থিওরীতে দেশটা উৎসন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে কাজ করে যাবে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে, শুনিসনি?—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। ‘নায়মাত্মা বলহীনে লভ্যঃ’—শরীরে-মনে বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে-মুখে খুব জোর করবি। ‘আমি হীন, আমি হীন’ বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়। শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিন্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

যার ‘মুক্ত’-অভিমান সর্বদা জাগরুক, সেই মুক্ত হয়ে যায়; যে ভাবে ‘আমি বদ্ধ’, জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশা। ঐহিক পারমার্থিক উভয় পক্ষেই ঐ কথা সত্য জানবি।

ইহ জীবনে যারা সর্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা’—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, এ-কথা ধরুব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল্ ‘অভীঃ, অভীঃ।’ সকলকে শোনা ‘মাইভেঃ মাইভেঃ’—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্যের সূর্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডীর বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন,

ভয়াদস্যগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৪৫

যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিক্রপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—‘অভীঃ, অভীঃ।’—বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন ‘অভীঃ’ মূর্তিমান্ হইয়া গুরুরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ এই দেহধারণ করে কত সুখে-দুঃখে—কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও-সব মূহূর্তকালস্থায়ী। ঐ-সকলকে গ্রাহ্যের ভেতর আনবিনি, ‘আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা’—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ‘আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা’—এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ-কষ্টের সময় আপনা-আপনি ঐ ভাব মনে পড়বে, চেষ্টা করে আর আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ী গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগল—‘সোহহং সোহহং’; বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম৪৬ আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে ‘সোহহং সোহহং’—কেবল শুনতে লাগলুম ‘একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।’

শিষ্য॥ (স্তম্ভিত হইয়া) মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।

স্বামীজী॥ না রে! শাস্ত্রও পড়তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুলছি। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত পড়া হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াবে।

শিষ্য॥ আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজী॥ যখন জয়পুরে ছিলাম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘স্বামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না! আমাদের দ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।’ ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভেঁসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, ‘আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন করে উদ্ধার করলেন?’ তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরুও চূর্ণ করতে পারা যায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত।

স্বামীজী॥ অদ্ভুত বলে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, তা-ও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান্— তাঁর কথা ভাব—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য

আছে মাত্র। এই আত্মা বিকাশ করবার চেষ্টা কর। দেখবি— বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হলে দেখবি, দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর, জীবকে অভয় দিয়ে বল—‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’—Arise! Awake! And stop not till the goal is reached. (ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থামিও না।)

১৭

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—১৮৯৮

আজ দু-দিন হইল শিষ্য বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ-সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধনভজনের উদ্যম, কত দীনদুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে।

আজ স্বামীজী শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আনন্দ আর ধরে না। প্রসাদ-গ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদসেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেনঃ

এমন জায়গা ছেড়ে তুই কিনা কলিকাতায় যেতে চাস—এখানে কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?

শিষ্য॥ মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি, কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজী॥ আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ—সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিচ্ছিলুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহাসমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। ‘অবাঙ্‌মনসোগোচরম্’ কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা ‘আমি ব্রহ্ম’ এ-কথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও ‘আমি’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—দ্বৈতভান থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থালভের জন্য বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন, ‘দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।’

শিষ্য॥ নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আর পুনরায় অহংজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈতভাবের রাজত্বে—সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজী॥ ঠাকুর বলতেন, ‘একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবনের আর ব্যুৎপান হয় না; একুশ দিন মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।’

শিষ্য॥ মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়, মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না, তখন আবার বিক্ষিপের—আবার অহংজ্ঞান লইয়া সংসারে ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজী॥ বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।’ কিন্তু অবতারেরা এক-আধটা সামান্য বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার super conscious state (জ্ঞানাভীত ভূমি) থেকে conscious state-এ—‘আমি তুমি’-জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে আসেন।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে নিঃশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিরূপে? কারণ শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজী॥ মহাপ্রলয়ের পরে তবে সৃষ্টিই বা আবার কেমন করে হবে? মহাপ্রলয়েও তো সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তারপরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—সৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্তনের মত অবতার-পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুৎপানও তেমনি অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে?

শিষ্য॥ আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির—আপনি যেমন বলেন potential (অব্যক্ত) আকার-ধারণ মাত্র?

স্বামীজী॥ তা হলে আমি বলব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই—যা নির্লেপ ও নির্গুণ—তাঁর দ্বারা এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভব হয়, তার জবাব দে।

শিষ্য॥ ইহা তো seeming projection (আপাতপ্রতীয়মান বহিঃপ্রকাশ)! সে কথার উত্তরে তো শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশটা মরুমরীচিকার মত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তিবশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজী॥ সৃষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি থেকে ব্যুৎপানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস তো? জীব স্বতই ব্রহ্মস্বরূপ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে ‘আমি আত্মা’ এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হলে ভ্রম, কারণ শাস্ত্র বলছে, You are already that (তুমি সর্বদা ব্রহ্মই হয়ে রয়েছ)। অতএব ‘অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি’—তুই যে সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিস, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য॥ এ তো বড় মুশকিলের কথা; আমি যদি ব্রহ্মই, তবে ঐ বিষয়ের সর্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী॥ Conscious plane-এ ('তুমি- আমি'র দ্বৈতভূমিতে) ঐ কথা অনুভূতি করতে হলে একটা করণ বা যা দ্বারা অনুভব করবি, তা একটা চাই। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা তো জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন, 'চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা'-চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিশ্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলে মনে হয় এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ বলে বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, এ-কথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে তো আর কোন করণ নেই—এক আত্মাই আছেন; সুতরাং যাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্তা কর্ম করণ—এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্য শ্রুতি বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' ফল-কথা conscious plane-এর (দ্বৈতভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্ম-করণাদির দ্বৈতভান নেই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। অন্য ভাষা নেই বলে ঐ অবস্থাটিকে 'প্রত্যক্ষ' করা বলছি; নতুবা সে অনুভব-প্রকাশের ভাষা নেই! শঙ্করাচার্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাস দেন। সেজন্যই বলে, (আপ্তপুরুষের) অনুভব থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে যাওয়ার' মত; বুঝলি? মোট কথা হচ্ছে যে, 'তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম' এই কথাটা জানতে হবে মাত্র; তুই সর্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে 'মায়া' বলে) এসে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না; সেই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপাদানে নির্মিত মনরূপ পদার্থটা প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হন। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকার-স্বরূপ। পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে; তখনই অনুভূতি হবে— 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, 'তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি?—তবে শো।' শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্য স্বামীজীর

অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে স্বামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামী-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘তোমার পূজা তো হল, কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের পুজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পুজো করলি?’ কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, ‘ওরে, দেখ, আজ কি কাণ্ড করেছে! ঠাকুরের পুজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পুজো করেছে।’ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?’ কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু; অখাদ্য দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখনও কখনও ‘ভট্‌চাষ’ বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতে জলযোগসময়ে বিলাতী বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, ‘ভট্‌চাষকে ধরে নিয়ে আয় তো।’ আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদস্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, ‘আজ কি খেলি তা জানিস? এগুলি ডিমের তৈরী!’ উত্তরে সে বলিল, ‘যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।’ শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘আজ থেকে তোমার জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপপুণ্যাদি, অভিমান জন্মের মত দূর হোক—আশীর্বাদ করছি।’

অপরাহ্নে স্বামীজীর কাছে মান্দ্রাজের একাউন্টেন্ট জেনারেল বাবু মন্থনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে মান্দ্রাজে স্বামীজী কয়েক দিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ঐ-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া এবং অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, ‘একদিন এখানে থেকেই যান না।’ মন্থনাথবাবু তাহাতে রাজী হইয়া ‘আর একদিন এসে থাকা যাবে’ বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৮

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটি
কাল—১৮৯৮

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, ‘কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর।’ শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাষ্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘারে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেনঃ

অনেক দিন মাষ্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারি করিস না।

শিষ্য॥ তবে কি করিব?

স্বামীজী॥ কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য॥ কি ব্যবসা করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী॥ পাগলের মত কি বকছিস? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু ‘আমি কিছু নই’ ভেবে ভেবে বীৰ্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতের দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তরতর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত ‘চাকরি দাও, চাকরি দাও’ বলে চেষ্টাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন

সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ করে তাদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে civilization (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তাদের এমন দুর্দশা? ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষাও যে তাদের দুর্দশা হয়েছে! তোরা আবার তাদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈরি করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তাদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে ‘হা অন্ন, হা অন্ন’ করে বেড়াচ্ছিস!

শিষ্য॥ কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ উপায় তাদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস, ‘আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!’ চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, দেখবি মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিষের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে করে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তাদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্ না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী॥ নেবে কিনা, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচিত) করে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দেব। তারপর দেখবি—কত লোক তাঁদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবি।

শিষ্য॥ করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী॥ আমি যে করে হোক তোকে start (আরম্ভ) করিয়ে দেব। তারপর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। ‘হতো বা প্রাক্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্’—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য॥ আজে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী॥ তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম। হয় ঐ-প্রকার উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য মান্য সফল) হ—নয় তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর। তবে তো আমাদের মত ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারুর দিকে চায় না। দেখছিস তো আমরা দুটো ধর্মকথা শোনাই, তাই গেরস্তেরা আমাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে, parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসনগুলি)। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে তোদের অন্ন পর্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের criticize (দোষগুণ-বিচার) করতে যাস—আহম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত

হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেষ্টামিচি করলে কি হবে?

শিষ্য॥ মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী॥ কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পাড়া যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) জাত তৈরী হচ্ছে। কেবল machine (কল)-এর মত খাটছিস, আর ‘জায়স্ব ম্রিয়স্ব’ এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্রাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই-সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা ‘হা চাকরি, জো চাকরি’ করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল তো আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী॥ তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মত শার্ট-কোট পরে সভ্য না-হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্তবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলিকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়,

তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তাদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মত একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, ‘তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।’ তাদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শত-গুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদানপ্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মত উর্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে?

স্বামীজী॥ তা কেন হবে? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? ‘সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ’—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্ত ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা

করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তাদের শ্রেণীর ভেতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতিটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল—বল্ দেখি? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তা না হলে কিন্তু তাদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তাদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তাদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে। ভেবে দেখ্—গল-জাতের হাতে অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তাদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তাদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ ও-সব কথা এখন থাক; তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল। যা হয় একটা কর। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয় তো আমাদের মত ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিস সবই ক্ষণিক—‘নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্’ ৪৭। অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলম্ব করিস নে। এখুনি অগ্রসর হ। ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।’ পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’

১৯

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী ও নূতন মঠভূমি

কাল—৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে; ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—এই বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন। তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর-ঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাঙ্ঘ্রি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেনঃ

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, ‘তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।’ সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত ‘বহুজনহিতায়’ ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।

শিষ্য॥ ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছেন?

স্বামীজী॥ (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিসনি?—কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য॥ ওঃ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল?

স্বামীজী॥ ‘দলাদলি’ ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে রাঙিয়ে এক একজনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙীন কাঁচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট বলে দেখছি। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎকালে ঐরূপ ‘দল-ফল’ সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝলসে যায়; অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি সব ভেসে যায়। কাজেই ‘দল-ফল’ করবার তাদের অবসর হয় না; কেবল যে যার নিজের ভাবে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং সেজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজী॥ হাঁ, এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ্ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।

শিষ্য॥ তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় হইবে?

স্বামীজী॥ হবে বৈকি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।

সকলেই করজোড়ে ঐরূপে প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নেই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে নিয়ে চল।’ শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘ভয় নেই, মাথায় কর, আমার আজ্ঞা।’

শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটা-মস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, ‘ঠাকুর আজ তোমার মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ করছেন। সাবধান, আজ থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিসনে।’ একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন, ‘দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্ক থাকি।’

এইরূপে নির্বিঘ্নে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বার বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তাদের মত ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। একরূপ হলে কেমন হয় বল দেখি?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা!

স্বামীজী॥ কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পণ্ডন-মাত্র করে দিচ্ছি—এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব; আর তাদের ভেতর নানা idea (ভাব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (নীতি) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ (কর্মক্ষেত্রে) দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে practical religion (কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম)।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজী॥ শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটু দক্ষিণী ভট্টাচার্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না—এ কথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের৪৮ কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্বজন্মের ব্রাহ্মণ-শরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিল। বলি, আজকাল যদি ঐরূপ কোন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল,

তাই তার হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কি রে বাবা? বেদ তো ত্রৈবর্গিক-মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে, কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন—তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কিনা তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের ঐরূপ কাজকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজ-জীবন দান করতে সর্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া!

শিষ্য॥ বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য এক প্রকারের পাগলামি বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কিনা নিজের গলা দিতে গেলেন!

স্বামীজী॥ কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism (ধর্মোন্মাদ)—এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হল—তা দেখ্! কত আশ্রম-স্কুল-কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হল, তা ভেবে দেখ্! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে এ-সব ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ত্ব—তাও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেব সেগুলো practical field-এ (কার্যক্ষেত্রে) আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্তি।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙিয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম ভারত হইতে কালে নির্বাসিত হইয়াছে—এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ বৌদ্ধধর্মের ঐরূপ দুর্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর follower (চেলা)-দের দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চা করে) তাদের heart (হৃদয়)-এর উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তন্ত্রে নেই। বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ‘জগন্নাথক্ষেত্র’—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা

বীভৎস মূর্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পারবি। রামানুজ ও চৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ-সকল মহাপুরুষের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?

স্বামীজী॥ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান-মহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ—কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐ-সকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এইজন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে। তবে স্থির জানবি মানবদেহের চেয়ে আর কোন বড় তীর্থ নেই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নয়। ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস না—‘আত্মানং রথিনং বিদ্ধি’ ৪৯ ইত্যাদি, ‘মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে’—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে ‘রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে’—এর মানে হচ্ছে, তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিন্তুুতকিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্বদা ‘আমি’ বলে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হত, তা হলে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেল যোগার যে সুযোগ! ৩ জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি ‘কিছু নয় বা মিথ্যা’ বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্তি-অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম আলাদা?

স্বামীজী॥ তাই তো, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই truth (সত্য), তবে relative truth different in degrees (আপেক্ষিক সত্যে তারতম্য আছে)। মানুষ যা কিছু সত্য বলে জানে, সে সকলই ঐরূপ; কোনটি অল্প

সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান্। এই আত্মা জড়ের ভেতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, ‘জীব’নামধারী মানুষের ভেতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণে, বুদ্ধ-শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই super conscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—‘অবাঙমনসোগোচরম্।’

শিষ্য॥ মহাশয়, কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—‘ঐ-সকল কথা ছাড়িয়া সর্বদা ভাবে থাক।’

স্বামীজী॥ তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ করতে করতে তাদের ভেতরেও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠবেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা করছি, তাও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির মত কোন একটা ভাব ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন করে হবে? ও-সব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভেতরেও সিংহ (সিংহ, ব্রহ্ম) জেগে উঠবেন। ঐ সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেনঃ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

২০

স্থান—কলিকাতা

কাল—১৮৯৮

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে াবলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। আজ সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, ‘তোরা আগে চলে যা আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।’ ...

প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীন্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্মবাবু উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে বিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীবজন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাক্ষিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, ‘ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।’ কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, ‘তোরা না কচ্ছপ খাস? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে; তা হলে তোরা সাপই খাস!’ ইহা শুনিয়া শিষ্য ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, ‘মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া গেলে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন?’

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্মবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্মাবাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থ রামব্রহ্মাবাবুর বাসাবাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্মাবাবু॥ ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

স্বামীজী॥ ডারুইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ)-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।

রামব্রহ্মাবাবু॥ এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী॥ সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলে আমার ধারণা।

রামব্রহ্মাবাবু॥ সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়। স্বামীজী॥ নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক নির্বাচন) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ-সকলের একটিও তার কারণ বলে সমর্থিত হয়নি। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক species-এ (জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা (প্রকৃত্যাপূরণ) ৫০ সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার) সঙ্গে দিনরাত

struggle (লড়াই) করে যে ওটা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণসংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতীলাভরূপ মত)-টা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, ‘ভারতবর্ষে এখন আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশবাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।’

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনের মিনিট পূর্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে গিয়া রামব্রহ্মবাবুর ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা

করিয়েছেন শুনিয়া উপস্থিত সকলে ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য॥ মহাশয়, পশুশালার ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী॥ কেন, কি বুঝিসনি?

শিষ্য॥ এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উল্টা কথা বলিলেন। স্বামীজী॥ উল্টো বলব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিসনি। Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্যজগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞানবুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। মনে কর, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যের প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য Animal Kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মত rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন করে progress (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের Struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবের প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানব-জীবন)-এ মনের ওপর

আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মত মনুষ্যের প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য॥ তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজী॥ তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (বিচারবুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণবিকাশস্থল) ‘মানুষ’ পদবাচ্য আছিস? আহা! নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাসনি, এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, ‘মানুষ আছে যার, সেই মানুষ।’ তোরা তো ‘জায়স্ব ম্রিয়স্ব’-বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আশ্রয় হয়ে রয়েছিস। তোরা animal (প্রাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরী-ফিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব এবং মানবের স্তরের) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কিনা! Physique (দেহ)-টাকে আগে গড়ে তোল। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। ‘নায়মাত্মা বলহীনে লভ্যঃ।’ বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, ‘বলহীনে’ অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু ‘ব্রহ্মচর্যহীনে’ বলেছেন।

স্বামীজী॥ তা বলুনগে। আমি বলছি, the physically weak are unit for the realization of the Self (দুর্বল শরীরে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না)।

শিষ্য॥ কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়।

স্বামীজী॥ তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস, তা হলে তারা যত শীগগীর তা work out (কার্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিস না, ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শূঁটকো লোকগুলো শীগগীর রেগে যায়—শীগগীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী॥ তা নেই কে বলছে? মনের ওপর একবার control (সংযম) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে যে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না; ঠাকুর বলতেন, ‘শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।’ কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, ‘আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্‌চাষ বামুন নিবেদিতার ঐটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?’

শিষ্য॥ তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম; আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী॥ তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চাষ বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য॥ না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

৫. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ২১-২৫

২১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটা

কাল—১৮৯৮৮

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাশ্বরবাবুর বাগানবাটাতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে এবং বর্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখনও জঙ্গলপূর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ী ছিল; উহারই সংস্কার করিয়া বর্তমান মঠ-বাড়া নির্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বলিলেনঃ

এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals (উচ্চাদর্শসকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্দিগন্তের প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে এরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।

মঠের দক্ষিণ ভাগে ঐ যে জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ভক্তি শাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা

দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ 'বিদ্যামন্দির' স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হলে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে পারবে। মঠে মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হলে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারীগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, মঠস্বামিগণ তাদের তখনি বহিস্কৃত করে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে। এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে, তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। তারা অধ্যয়ন-মাত্র সকলের সঙ্গে একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হলে কেউ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে না। ক্রমে এক্রূপে যখন এই মঠের কাজ আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল দেখি?

শিষ্য॥ আপনি তবে প্রাচীনকালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান?

স্বামীজী॥ নয় তো কি? Modern system of education-এ (বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্বের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এখন broad basis (উদারভাব)-এর উপর তার foundation (ভিত্তিস্থাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে বলব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে, ঐটিও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের 'অন্নসত্র' হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে ঐ অন্নসত্র প্রথম খুলতে হবে। চাই কি প্রথমে দু-তিনটি লোক নিয়ে start (আরম্ভ) করতে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারীদের এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শেখাতে) হবে! তাদের যোগাড়-সোগাড় করে, চাই কি ভিক্ষা করে এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ-বিষয়ে কোন রকম অর্থসাহায্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারীদের ওর জন্য অর্থসংগ্রহ করে আনতে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training

(শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা 'বিদ্যামন্দির'-শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে। অন্তত পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর—একুনে দশ বৎসর training (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ তাদের সন্ন্যাসী করা অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদগুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করে মঠাধ্যক্ষ তাকে যখন ইচ্ছে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্বে যেমন বললুম, সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই-সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠে এরূপ তিনটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজী॥ বুঝলিনি? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্মল হয়ে তাতে সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যালাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী॥ তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পারলিনি! শোন—এই অন্ন-হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে সেবাকল্পে ভিক্ষা-শিক্ষা করে যেকাপে হোক দুমুঠো অন্ন দীনদুঃখীকে দিতে পারিস, তা হলে জীব-জগতের ও তোর মঙ্গল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই এই সংকাজের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সংকাজের জন্য তোকে বিশ্বাস করে কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারীরা তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কাজে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি, তত আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সংকাজে মানুষ কেন,

ভগবানও সহায় হন। এরূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্যে দিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান।

শিষ্য॥ মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম-স্থান চাই, তারপর ঐজন্য ঘর-দ্বার নির্মাণ করা চাই, তারপর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

স্বামীজী॥ মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি অন্ধ আতুর সন্ধান করে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা করে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রৈঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কাজে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! ‘ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাতে গচ্ছতি।’ ৫১

শিষ্য॥ হাঁ, তা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে কালে কর্মবন্ধন তো ঘটিতে পারে?

স্বামীজী॥ কর্মের ফলে যদি তোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হলে ঐ সব সংকাজ তোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্মে বন্ধন আসবে!—ও-কথা তুই কি বলছিস? এরূপ পরার্থ কর্মই কর্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।’

শিষ্য॥ আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী॥ গরীব-দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ু-চলাচলের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দু-জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভাল বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবেন। হস্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটা ward (বিভাগ)-এর মত থাকবে, তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল ‘দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্’ এই রব উঠবে। ভাতের

ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য॥ আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টি বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গঙ্গার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেনঃ

তোদের ভেতর কার কবে সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো দুনিয়াময় অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ঈশ্বর করেন তো এ মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম তখন মনে হল, যেন এখান হতে তার ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে! আমি তো যথাসাধ্য করছি ও করব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে। বেদান্ত কেবল পড়ে কি হবে? Practical life (কর্মজীবন)-এ শুদ্ধদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।

শিষ্য॥ মহাশয়, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে বাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী॥ সেটা তো নেশা করে অচেতন হয়ে থাকার মত; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখনও বা তাণ্ডব নৃত্য করবি, কখনও বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিষ পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ করে না-হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে! তখনই নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে! ‘নিরবধি গগনাভ্যম্’—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাকতে পারবিনি। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta (কর্মে পরিণত বেদান্তের অনুভূতি)—বুঝলি। তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিকভাবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস?—একমাত্র মাটি, যা এর প্রকৃতি সত্তা। সেরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ—সব ভাবছিস ও দেখছিস। জ্ঞান-প্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন—যা কিছু সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য॥ এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ কোথেকে এল তা পরে বলব। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়তে লাগলি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল?—না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য॥ অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী॥ তা হলে ভেবে দেখ—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া বলে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কিনা? তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না?

শিষ্য॥ তা হবে।

স্বামীজী॥ তা যদি হয়, তবে নাম-রূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। একরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দাক্ষকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব-বিভাসক আত্মার সত্তা বুঝতে পারিসনে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অনুভব করবি, তখনি আব্রহ্মসুস্থ পর্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে—তখনি ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্ধ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ’ ৫২

শিষ্য॥ মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী॥ যে জিনিষটা পরে থাকে না—সে জিনিষটা যে মিথ্যা, তা তো বুঝতে পেরেছিস? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছ সে বলবে, অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ বলে দেখতে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! সেজন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সংও বলা যায় না—অসংও বলা যায় না—‘সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো’। যে জিনিষটা একরূপে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হতে পারে না। কেন, তা শোন।—এই প্রশ্নোত্তরটাও তো সেই নাম-রূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে। যে ব্রহ্মবস্তু নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বোঝান যায়? এইজন্য শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারিকভাবে সত্য—পারমার্থিকরূপে সত্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অস্তিত্বই নেই, তা আবার বুঝবি কি? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন করবার অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই ‘মুচি-মুটের গল্প’ শুনেছিস না?—ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজী॥ যে জিনিষটাই নেই, তা আবার আসবে কি করে?—থাকলে তো আসবে?

শিষ্য॥ তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজী॥ এক ব্রহ্মসত্তাই তো রয়েছেন! তুই মিথ্যা নাম-রূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখছিস।

শিষ্য॥ এই মিথ্যা নাম-রূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্যপ্রায় বলেছে, কিন্তু ওটা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্বদা দড়ার মত স্ব-স্বরূপেই রয়েছে। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। বুঝলি?

শিষ্য॥ একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী॥ কি বল্ না? শিষ্য॥ এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাহাদের কোন স্বরূপ-সত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্বে দেখে নাই, সে জিনিষের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না; সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টিভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে, তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে! ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজী॥ ব্রহ্মাজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। তুই যদি বলিস, ‘আমি তো এই সৃষ্টি বা সাপ দেখছি’, তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান বা সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টিভানাди চলে এসে থাকে তো থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নেই। ব্রহ্মতত্ত্ব ‘করামলকবৎ’ প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না এবং হলে আর প্রশ্নও উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন ‘মূকাস্বাদনবৎ’ হয়।

শিষ্য॥ তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজী॥ ঐ বিষয়টি বোঝাবার জন্য বিচার। সত্য বস্তু কিন্তু বিচারের পারে—‘নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।’ ৫৩

এইরূপ কথা চলিতে চলিতে শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে মঠে ৫৪ আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।’

২২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতাপ্রভাবে ইওরোপ-আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা—আমাদের বিবেচনায় এখানেই ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামীজী॥ এদেশে আগে ground (জমি) তৈরী করতে হবে, তবে বীজ ফেললে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। তাদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন, রোগশোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লোকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য॥ কেন, আপনিই তো কখনও কখনও বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্যতঃ ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে তেমন নহে। তবে আপনার জ্বলন্ত বাগ্মিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামীজী॥ ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। ঐকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানী, সবচেয়ে তাদের পরস্পরের ভেতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তাদের দেশের অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য॥ তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন?

স্বামীজী॥ প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তাদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোড় একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিষ্য॥ তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামীজী॥ অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে।

দেখাচ্ছিলেন—পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার-ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গায়ে-গায়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, ‘ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?’ আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকল না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মত তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাৱশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামীজী॥ দূর মূর্খ! শক্তি-ফক্তি কেই কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশী হই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামীজী॥ তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস তো ভগবান তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। ‘ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি’—গীতায় পড়েছিস তো?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেৱায়

নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাববি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চুষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।

শিষ্য॥ মহাশয়, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়; তাহা কোথায় পাইব?

স্বামীজী॥ বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর না। পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও তো তাদের শোনাতে পারিস। না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামীজী॥ ‘হাঁ পারি’ কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস—তা কাজে আমায় দেখা, তবে তো জানব আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা। কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে—ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—‘তোমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।’ নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী করগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) ভেতর যারা আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তাদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা তাদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের

দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরী করিসনি — মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে আর বসে থাকিসনি—তা হলে কিছুই হবে না।

২৩

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন?

স্বামীজী॥ সত্যই হন বা আর যাই হন, ব্রহ্মবস্তুকে কে জানে বল? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌঁছান যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পারতিস, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখতে পেতিস না।

শিষ্য॥ মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামীজী॥ বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে ‘ব্যতিরেকী বিচার’ বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখান যে, সেটা ভাব নয়—অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌঁছানর কথা বলছিস—কেমন?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করি।

স্বামীজী॥ আচ্ছা। এখন দেখ, বেদ বলছে, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম’, যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিথ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস তো?

শিষ্য॥ বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি না মানে, তাহাকেও তো নিরস্ত করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না; ইন্দ্রিয়গুলিও ভুল সাক্ষ্য দেয় এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই ঋষিরা ‘যোগ’ বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই ফল পাওয়া যায়। করে দেখ—হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি—ঋষিরা যা বলেছেন, সব সত্য। এই দেখ—তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়—অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য॥ কখন ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামীজী॥ একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ী, দোর-দালান, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল। তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল—চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, ‘ওগো, তুমি আমার কি করছ গো, আমার যে বাপ-মা আছে!’ ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে ‘তবে এখন থাক’ বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ী দোর-দালান যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম রয়েছে। আর একদিন আমেরিকার একটি lake-এর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল। শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও

তো হইতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি?

স্বামীজী॥ যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি করে বলবি, বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থানান্তরের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্ব পূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য॥ না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শত শত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—‘ক্ব গতং কেন বা নীতং’৫৫ ইত্যাদি।

স্বামীজী॥ জানবি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে—তা হলে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হয়ে কামকাঞ্চে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাববান হইতেছি কেন?

স্বামীজী॥ তুই মনে করছিস, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি? একটু ভেবে দেখ—বুঝতে পারবি, যে যা করছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠতে পারছে না। সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছে। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে—ঠিক ঠিক ভাবেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি করে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এতে খাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে ক্রমশঃ স্ব-

স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে—সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।

শিষ্য॥ সে চৈতন্য হওয়া—মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামীজী॥ ঠাকুরের কৃপা-বাতাস তো বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। যখন যা করবি, খুব একান্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি—সবই ক্ষণিক; এর পারে যা, তাই আমি।

শিষ্য॥ ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার তখনই উড়িয়া যায় এবং ছাইভস্ম সংসার ভাবি।

স্বামীজী॥ ও-রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি—যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখনও অন্যায় কাজ করতে পারি? আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মত মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর করবি; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাকব।

স্বামীজী॥ মনে যখন ও-সব আসবে, তখন বিচার করবি। তুই তো বেদান্ত পড়েছিস? ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। ঐরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য॥ আচ্ছা স্বামীজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না।

স্বামীজী॥ আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও-রকম কথা আছে। বৈরাগ্য-বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে ‘ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেহপি’—ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম,

তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি—নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানার মত হচ্ছে! ‘ন ধনে ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।’

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামীজী॥ ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে-সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ-ফাঠ করছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ করে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আসতে হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন, তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামীজী॥ সংসারে রয়েছি, তাতে ভয় কি? ‘অভীরভীরভীঃ’—ভয় ত্যাগ কর। নাগ-মহাশয়কে দেখেছি, তো?—সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়ী! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেউ হয় তো যেন নাগ-মহাশয়ের মত হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি—যেন তাঁর কাছে যায়, তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ-মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর, তাঁকে জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামীজী॥ তা একবার বলতে? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব। তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস।

শিষ্য॥ আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘পূর্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে।’

স্বামীজী॥ জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, ‘জ্বলন্ত আগুন।’

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়েছি।

স্বামীজী॥ অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য॥ যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলঃ স্বামীজী কি অদ্ভুত পুরুষ—যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি আচার্য শঙ্কর!

২৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামীজী॥ কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস

তো?৫৬

শিষ্য॥ আজ্ঞা

স্বামীজী॥ কিন্তু মুখ্য ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্য ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেমস্বরূপ উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস তো কার ওপর আর হিংসাদ্বेष করবি? সেই প্রেমানুভূতি এতটুকু বাসনা—ঠাকুর যাকে বলতেন ‘কামকাঞ্চনাসক্তি’—থাকতে হবার যো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্বত্র

একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার যো নেই।

শিষ্য॥ তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামীজী॥ তা বৈকি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখছিস তো বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে ‘সচ্চিদানন্দ’ বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে—‘সৎ’ অর্থাৎ অস্তিত্ব, ‘চিৎ’ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, আর ‘আনন্দ’ই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য-সত্ত্বাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-সত্ত্বাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ।

শিষ্য॥ তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামীজী॥ কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখনও বড় হতে পারে না। কেন না, অধিকারিভেদে একই উদ্দেশ্যলাভ নানবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস—জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলছেন—পূবমুখো হয়ে বসে ভগবান্কে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর একজন বলছেন—না, পশ্চিমমুখো হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বহুকাল পূর্বে পূবমুখো হয়ে বসে ধ্যানভজন করে ঈশ্বরলাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, পূবমুখো হয়ে না বসলে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বললে—সে কি কথা? পশ্চিমমুখো বসে অমুক ভগবান্ লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে! আমরা তোদের ঐ মত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়তো হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল—‘নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।’ কেউ

আবার ‘আল্লা’ বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চলতে লাগল। আমাদের এখন দেখতে হবে—এই সকল জপ-পূজাদির খেই (আরম্ভ) কোথায়। সে খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষায় ‘শ্রদ্ধা’ কথাটি বোঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। ‘একাগ্রতা’ কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় ‘একাগ্রনিষ্ঠা’ বললে সংস্কৃত শ্রদ্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্রমনে যেকোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলছে বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগ-পরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সেইসব মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তাদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়-পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামীজী॥ পূর্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলো সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তাদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য॥ কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য॥ কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামীজী॥ এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবন-লীলা কি সত্য নহে?

স্বামীজী॥ তা কে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি আপনি বলতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাতি ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামীজী॥ আমার তো বোধ হয় তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকী সব জানবি ঘোর তমোভাবাপন্ন—full of morbidity (মানসিক দুর্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, শুনিয়েছি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) তো সকলকে লইয়া সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামীজী॥ তার কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়? তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন—সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারিনি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মত ছিল। কিন্তু চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামীজী॥ তোর অবতার কথাটার মানেটা কি? তা আগে বল?

শিষ্য॥ কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের মত পুরুষ।

স্বামীজী॥ তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)-কে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা। থাক এখন সে কথা, একটুকুই এখন শুনে রাখ—সময় ও সমাজ-উপযোগী এক এক মহাপুরুষের আসেন ধর্ম উদ্ধার করতে। তাঁদের মহাপুরুষ বল বা অবতার বল, তাতে কিছুই আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবনকে নিজ জীবন গঠন করবার ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরী হয় এবং সম্প্রদায় চলতে থাকে। কালে ঐ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হলে আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার তো শক্তি—বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামীজী॥ তার কারণ, আমি তাঁকে অল্লই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়—পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্লশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে ঐঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য॥ আজকাল অনেকে তো তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে!

স্বামীজী॥ তা করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় তো তুইও কর।

শিষ্য॥ আমি আপনাকেই সম্যক বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে! মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব।

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামীজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে।

২৫

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ, তাহাদের উপায় কি? তাহাদের তো দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

স্বামীজী॥ কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, তা গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জানবি—ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না।

শিষ্য॥ তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামীজী॥ উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড়গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না, ‘যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ’—বেদকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং তা বললেও হবে না।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয়-ত্যাগ হয়?

স্বামী। তা কি কখনও হয়? তবে সন্ন্যাসীরা কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা করছে; আর গেরস্তরা নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখনও মেটে কি রে? ‘ভূয় এবাভিবর্ধতে’—দিন দিন বাড়তেই থাকে।

শিষ্য॥ কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামীজী॥ দূর ছোঁড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস? ক্রমাগত বিষয়ভোগ করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, মন বিষয়ের রঙে রঙে যায়। ত্যাগ, ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য তো আছে—‘গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তুরাগস্য গৃহং তপোবনম্’—গৃহস্থশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামীজী॥ গৃহে থেকে যারা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা ক-জনের হয়?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আপনি তো ইতঃপূর্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই।

স্বামীজী॥ তা বলেছি; কিন্তু এ-কথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে; তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের এখনও কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসেনি।

শিষ্য॥ কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে?

স্বামীজী॥ যারা করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস—‘যাচ্ছি যাব, হচ্ছে হবে’ যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূর। ‘এখনই ভগবান্ লাভ করব, এই জন্মেই করব’—এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনই সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন, ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’—যখনই বৈরাগ্য আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন—ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এইসকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামীজী॥ তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না করে বসে থাক, দেখবি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য॥ ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লভ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব, ভাল হইব, ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামীজী॥ যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদের ভেতর জানবি Struggle (উদ্যম বা চেষ্টা) এসেছে এবং ঐ চেষ্টা করতে করতেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তো ইহাও দেখা যায়—যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধনভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?

স্বামীজী॥ জানবি—তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য॥ তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেই তো তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামীজী॥ হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি? এবং ঐ পথেও তো ‘কি করে মনের এ অশান্ত দূর করি’—এইরূপ একটা বিষম হাঁকপাকানি ও চেষ্টা আছে।

শিষ্য॥ তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কাম-কাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামীজী॥ হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে এদেরই ‘কৃপাসিদ্ধ’ বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত—এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য॥ তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, ‘কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই; যদি থাকে তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।’

স্বামীজী॥ তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অভ্যাসে একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখান Law of Causation (কার্য-কারণ-সম্বন্ধে) নেই, কাজেই সেখানে কে করে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য-সেবক, ধ্যাতা-ধ্যৈয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

শিষ্য॥ আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামীজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল।

৬. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ২৬-৩০

২৬

স্থান—বেলুড়মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি?

স্বামীজী॥ অল্পবিস্তার আছে বৈকি।

শিষ্য॥ মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যিক কি?

স্বামীজী॥ খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার.৫৭। তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস ও উদ্যমশূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীৰু ও কাপুরুষ!

শিষ্য॥ মাছ-মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মে অহিংসাকে ‘পরমো ধর্মঃ’ বলিয়াছে কেন?

স্বামীজী॥ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে! অমন ‘বক-ধার্মিক’ এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে দেখ—বৈদিক ও মনুস্মৃতি ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে।

অধিকারিবিশেষে হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলছেন—‘মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি’; মনুও বলেছেন—‘নিবৃতিস্তু মহাফলা।’

শিষ্য॥ কিন্তু এমন দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই লোক আগে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপ অপেক্ষাও যেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!—এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী॥ কোথেকে এল, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে, তা তো দেখতে পাচ্ছিস? দেখনা—তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছমাংস খায়, কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙলার লোকের চেয়ে সুস্থশরীর। তোদের পূর্ব-বাঙলার বড় মানুষেরাও এখনও রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মত অশ্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অশ্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝতেই পারে না।

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ। আমাদের দেশে অশ্বলের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা দুবেলাই মাছ-ভাত খাইয়া থাকি।

স্বামীজী॥ তা খুব খাবি। ঘাসপাতা খেয়ে যত পেটরোগা বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও-সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়, মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, tremendous activity (প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা); আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা—এই সব।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মাছ-মাংসে তো রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামীজী॥ আমি তো তাই চাই। এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে-সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের লোককে মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতৎপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশসুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ-পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সত্ত্বগুণের অত্যন্ত স্ফূর্তি হয়, তখন মাছ-মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামীজী॥ না, তা থাকে না। সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ-মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি—পরের জন্য সর্বস্ব-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানতা, অহংবুদ্ধিশূন্যতা। এইসব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal-food (আমিষাহার)-এর ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখবি, মনে ঐসব গুণের স্ফূর্তি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জানবি হয় ভগ্নামি, না হয় লোক-দেখান ধর্ম। তোর যখন ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষহার ছেড়ে দিস।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তো আছে ‘আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি’—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সত্ত্বগুণী হইবার জন্য রজঃ-ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে? স্বামীজী॥ ঐ শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন—‘আহার’-অর্থে ‘ইন্দ্রিয়-বিষয়’, আর শ্রীরামানুজস্বামী ‘আহার’-অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করে জীবনটা কাটাতে হবে, না ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে? ইন্দ্রিয়সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে; আর ঐ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যই ভাল-মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্পবিস্তর বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়ঃ (১) জাতিদুষ্ট—যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশগুণা মাছি মরে পড়ে রয়েছে, রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়েছে। (৩) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কিনা, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখতে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝতেই পারে না, তা নিয়েই যত লাঠালাঠি চলছে, ‘ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা’ করে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই; গলায় একগাছা সুতো থাকলেই হল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নেই। খাদ্যের আশ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে

পারেননি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানতে পেরেছি—বাস্তবিকই সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্তব্য?

স্বামীজী॥ তা কেন বলব? আমার কথা হচ্ছে তুই বামুন, অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী, তেলেঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? কলিকাতার জাতবিচারটা আরও কিছু মজার। দেখা যায়, অনেক বামুন-কায়েতই হোটেলে ভাত মারছেন; তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্ন-বিচারের আইন করছেন! বলি—ঐ-সব কপটীদের আইনমত কি সমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, কলিকাতায় অধুনাতন সমাজে ঋষিশাসন চলিতেছে না?

স্বামীজী॥ শুধু কলিকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, পড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য॥ তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে?

স্বামীজী॥ ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। এই দেখ না ভারতের কোথাও আর চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য,

সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু ‘তোমায় ছোঁব না’ বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনই নয়।

২৭

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য॥ স্বামীজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা হইয়াছে কেন?

স্বামীজী॥ তোরাই সে জন্য দায়ী।

শিষ্য॥ বলেন কি? কেমন করিয়া?

স্বামীজী॥ বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাজনন হয়ে পড়েছিস!

শিষ্য॥ কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম?

স্বামীজী॥ কেন? ভট্টাচার্যের দল তোরাই তো বেদবেদান্তাদি যত সারবান শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের জাতদের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছুঁসনি, তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো চিরকাল ঐক্যপ করে আসছিস। ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, ‘তুই নীচ’, ‘তুই নীচ’—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, ‘আমি সত্যসত্যই নীচ।’ ইংরেজীতে একে বলে hypnotise (হিপনোটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা। ব্রাহ্মণের জাতগুলির একটু একটু করে চমক ভাঙছে। ব্রাহ্মণদের তল্লেমল্লে তাদের

আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তুকতাক এখন ভেঙে পড়ছে, পদ্মার পাড় ধসে যাবার মত, দেখতে পাচ্চিস তো?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামীজী॥ পড়বে না? ব্রাহ্মণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করেছিল! স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল! তার ফলও হাতে হাতেই পাচ্ছে।

শিষ্য॥ কি ফল পাইতেছে, মহাশয়?

স্বামীজী॥ ফলটা কি দেখতে পাচ্চিস না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তাদের হাজার বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী॥ কোথায় চলছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার—এই সব সর্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্টাচারের দল যা-তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন! কয়জন ভট্টাচার বৈদিক কল্প-গৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পড়েছেন? তারপর দেখ—বাঙলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মনুস্মৃতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিস—সর্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেইজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়া বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামীজী॥ বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচে পড়ে সমাজকে দিলে চলবে না কেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার ধারণা ছিল অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

স্বামীজী॥ কোথায় মানছে? তাদের নিজেদের দেশেই দেখ না—তন্ত্রের বামাচার তাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব করতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ পক্ষোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস, ভীৰু কাপুরুষ? অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্ঠায় কিনা হয়?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

স্বামীজী॥ আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্ঠার জন্যই তো তাঁরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্ঠা করলে আমরাই যে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হতে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

শিষ্য॥ মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তো বলিলেন, প্রাচীন আচারাди দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কন?

স্বামীজী॥ কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে পারছিস না। আমি কেবল বলেছি যে, প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি সমাজ ও সময়ের উপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য॥ আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী॥ তবে ও কি বলছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা-ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামীজী॥ তুই যদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং যা বলবি, তা হাতে-নাতে করে দেখাতে পারিস তো অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখীর মত যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাণীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুনবে বল?

শিষ্য॥ মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই-একটি উপদেশ দিন।

স্বামীজী॥ উপদেশ তো তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়লি, আরও কত কি পড়লি, বেশ করে ভেবে দেখ—এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি। সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি ও প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর এবং সময়োপযোগী মতসকল তাতে নিবদ্ধ কর; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের—সকল সম্প্রদায়েরই ঐসকল নিয়ম পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ দেখি ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেব'খন।

শিষ্য॥ মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামীজী॥ কেন চলবে না? তুই লেখ না। ‘কালো হ্যয়ং নিরবধিৰ্বিপুলা চ পৃথ্বী’—যদি ঠিক ঠিক লিখিস তো একদিন না একদিন চলবেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। তোরাই তো পূর্বে বৈদিক ঋষি ছিলি, শুধু শরীর বদলিয়ে এসেছিস বৈ তো নয়? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তাদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ। কি হবে দু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তাদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ কার্যে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু তো পশ্চাতে।

স্বামীজী॥ দূর ছোঁড়া, মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহঃ মৃত্যু-চিন্তা করে বারে বারে মরবি কেন?

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু চিন্তা না হয় নাই করিলাম, কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি?

স্বামীজী॥ ওরে, মৃত্যু যখন অনিবার্য, তখন ইঁট-পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের মত মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দু-দিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের মত অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে মরাটা ভাল নয় কি?

শিষ্য॥ আজে হাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

স্বামীজী॥ ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসুর কাছে দু-রাত্রি বকলেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহরনিদ্রা ত্যাগ করে অনবরত বকতে পারি। ইচ্ছা করলে তো আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। আর আজকাল দেখছি তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে। তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধ-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়, ‘তুচ্ছং ব্রহ্মপদং’ হয়ে যায়। তাদের মঙ্গল কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব!

শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামীজীর ঐ-সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘মহাশয়, আজ তবে আসি।’

স্বামীজী॥ আসবি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ—কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীরে, সাধুরা সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কলিকাতায় গিয়েই ছাইভস্ম ভাববি।

শিষ্য সহর্ষে বলিল, ‘আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব।’

স্বামীজী॥ ‘আজ’ কেন রে? একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিষ্য স্বামীজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে যুগপৎ নানা চিন্তার উদয় হওয়ার কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

২৮

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

স্বামীজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ীটি ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী আজ অপরাহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজীর হস্তে একটি দীর্ঘ ষষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণমুখে ফটক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন—এইরূপে বাড়ী হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ী পর্যন্ত বারংবার পদচারণা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধান হইতেছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেনঃ

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,

ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,

আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!

গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেনঃ ‘হেথা আসবে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী!’ বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হবে!—বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, ‘বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যানধারণা করলে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বলতেন।’

শিষ্য॥ মহাশয়, যাহারা আত্মনাঅবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামীজী॥ যাঁদের আত্মজ্ঞানে ‘নিষ্ঠা’ হয়েছে, তাঁদের ঐসব বিচার করবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হল? কত সাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক-আধটা বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে যে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল ঐ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। তবে অধিকারিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম; এবং যতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নেই। আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বলছেন, ‘ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।’

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যখন আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামীজী॥ কার্যকারণ-পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই ‘কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে’—এ কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ আত্মজ্ঞান পিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাকবে। তবেই হল—ঐ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন

আর কিছু নয়; কারণ ঐ সাধনাদি ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ-সব কর্মের ফল ত্যাগ করতে বলত না। অতএব মীমাংসাসাশ্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝলি?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

স্বামীজী॥ শরীর ধারণ করে সর্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম করতেই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই নিষ্কাম কর্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বললি ‘প্রবৃত্তি হবে কেন?’ তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যত কিছু কর্ম করা যায় তা সবই প্রবৃত্তিমূলক; কিন্তু কর্ম করে করে যখন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা-আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে—কর্মের অন্ত কোথায়? তখনি সে গীতামুখে ভগবান্ যা বলছেন, ‘গহনা কর্মণো গতিঃ’—তার মর্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধারণ করে কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে—কি নিয়ে থাকবে বল? তাই দু-চারটে সংকর্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সেই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্বকর্মত্যাগী—লোক-দেখান দু-চারটে কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। ঐরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্মযোগী বলে কথিত হয়েছেন।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামীজী॥ তা কেন? নিজের জন্য, আপন শরীর-মনের সুখের জন্য কর্ম না করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না, কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখলাভের জন্য কেন কর্ম করবেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা-কিছু কর্ম করে যান, তাতে জগতের হিত হয়—সে-সব কর্ম ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘তাঁদের পা কখনও বেচালে পড়ে না।’ তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িসনি—‘ঋষীণাং পুনরাদ্যনাং

বাচমর্থোহনুধাবতি।’—ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মীয় লীন হয়ে বৃত্তহীন-প্রায় হয়, তখনই [ঠিক ঠিক] ‘ইহামুত্রফলভোগবিরাগ’ জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করবার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুৎ্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীন অবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার ‘আমি-আমার’ রাজ্যে আসে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রারন্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে। মন তখন প্রায়ই super conscious (অতিচেতন) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়, তাই খাওয়া-দাওয়া থাকে—দেহাদি-বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই অতিচেতন ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা যায়; সে-সব কাজে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ-লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর super conscious state-এ (জ্ঞানাতিত ভূমিতে) সর্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন; এ সৃষ্টিতে সেজন্য কোন কিছু imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বলছিলুম, আত্মজ্ঞের ফলাসঙ্গরহিত কর্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য॥ আপনি ইতঃপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ—মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, ‘কর্ম কর্ম কর্ম—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।’

স্বামীজী॥ আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম, এ দেশের মত এত অধিক তামস-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভেতরে একাবারে ইঁট-পাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথায় প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ কত রজোগুণের বিকাশ! তাদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাস্থে paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে

ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে-চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত’—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা—তোমরা অমিতবীৰ্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্তি হতে পারবে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব, বাঙলা—যেদিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাশ করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোড় কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাও। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের ভেতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে

প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব এক তেজের মিলনে স্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষু যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেনঃ

ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নেই); ... ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে; কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্যকরে আলোকিত হবে।

২৯

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

মঠ-বাটী নির্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু-আধটু যাহা বাকী আছে, স্বামীজীর অভিমতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন। স্বামীজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি কিছুদিনের জন্য মঠের সামনে বাঁধা রহিয়াছে। স্বামীজী ইচ্ছামত কখনও কখনও ঐ বজরায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামীজীর ঘরে বসিয়া স্বামীজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে এই সময় স্বামীজী সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, গৃহস্থদের সঙ্গে হইতে দূরে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা—পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা হইতে লাগিল।

স্বামীজী॥ গেরস্তদের গায়ে-কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, না শোয়। আগে শাস্ত্রে পড়তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সহিতে পারে না। এখন দেখছি—ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চললে বালব্রহ্মচারীদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ন্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পর গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে-মিশে থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গণ্ডীর ভেতর না রাখলে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে তো দূরে থাকতেই হয়, তা ছাড়া স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্বের মত সমভাবে মিশিতে পারিবে না ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল, ‘কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও আর তেমন করি না!’

স্বামীজী॥ যত শুদ্ধসত্ত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্যবিহীন, দিনরাত অর্থ অর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পারবে না, কখনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে করবে না। এখানকার সন্ন্যাসীরা সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা, চিম্টে-হাতে, ঔষধ-দেওয়া সন্ন্যাসীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব—সকলই নূতন ধরনের ছিল, তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখনও সেজেগুজে বকৃত্তা দিই, আবার কখনও ‘হর হর ব্যোম্ ব্যোম্’ বলে ছাই মেখে পাহাড়-জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই।

শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তরতর করে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না করে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে?

এখন চাই গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্মযোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে তো দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি যে তিমিরে, তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্বদিকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজরাখানি ঘাটে আনা হইলে স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামীজী ছাতে বসিলে শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কলকল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান্ মরীচিমালী অন্ত যাইতে এখনও অর্ধঘণ্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামীজীর মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা! সে এক ভাবপূর্ণ রূপ—বুঝান অসম্ভব!

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামীজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন! শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটিতে ৩ গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাড়ীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতঃপূর্বে একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘বাগানটি বেশ, কিন্তু কলিকাতা থেকে অনেক দূর; ঠাকুরের শিষ্য (ভক্ত)-দের যেতে আসতে কষ্ট হত; এখানে মঠ যে হয়নি, তা ভালই হয়েছে।’

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩০

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৮৯৯ খ্রীঃ প্রারম্ভ

শিষ্য অদ্য নাগ-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।

স্বামীজী॥ (নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন তো?

নাগ-মহাশয়॥ আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হল। কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামীজী॥ শরীর কেমন আছে?

নাগ-মহাশয়॥ ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম।

ঐরূপ বলিয়া নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

স্বামীজী॥ (নাগ-মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি করছেন?

নাগ-মঃ॥ আমি দিব্য চক্ষু দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস, ঠিক ভক্তিতে মানুষ কেমন হয়!

নাগ-মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ-মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ-মঃ॥ প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে ব্রহ্মচারী-ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ-মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোদের পাঠ বন্ধ থাকল।’ সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশয়ের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। স্বামীজীও নাগ-মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামীজী॥ (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছি! নাগ-মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, ঐর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন! (নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারীদেরও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথা শোনান।

নাগ-মঃ॥ ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বলব? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি; ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মরলুম।

নাগ-মঃ॥ ছিঃ! ও-কথা কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামীজী॥ এ-সব যে মঠ-ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগ-মঃ॥ আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন। স্বামীজী সকলকে বলিলেন, ‘যাতে ঐর কষ্ট হয়, তা করো না।’ শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।

স্বামীজী॥ আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখবে।

নাগ-মঃ॥ ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, ‘গৃহেই থেকো।’ তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামীজী॥ আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ-মঃ॥ (আনন্দে উন্মত্ত হইয়া), এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?

স্বামীজী॥ আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ-মঃ॥ আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝতে পারেনি।

স্বামীজী॥ আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপ জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।

নাগ-মঃ॥ ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।

স্বামীজী॥ কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ-মঃ॥ তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ কাজ করতে মজবুত শরীর চাই; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম

। নাগ-মঃ॥ শরীর ধারণ করলেই—ঠাকুর বলতেন—‘ঘরের টেক্স দিতে হয়।’ রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী॥ মঠের এরা আমায় যত্নে রাখে।

নাগ-মঃ ॥ যাঁরা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামীজী ॥ নাগ-মহাশয়! কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছি। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না।

নাগ-মঃ ॥ ঠাকুর যে বলেছিলেন—‘চাবি দেওয়া রইল।’ তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামীজী ॥ একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ-মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামীজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিতেছিলেন—নাগ-মহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ‘আমরা থাকতে আপনি ও কি করেন?’ স্বামীজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেনঃ

ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগ-মহাশয় চার-পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কলিকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর একজন মিলে তো নাগ-মহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বললুম—আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ-মহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে শুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাব, নাগ-মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্নাবান্না করে তো আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ-মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বসলুম। আহারের পর, ওঁকে খেতে যেই অনুরোধ করা আর তখনি ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে কপালে আঘাত করে বলতে লাগলেন—‘যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব?’ আমরা তো দেখেই অবাক! অনেক করে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।

স্বামীজী ॥ নাগ-মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি?

শিষ্য॥ না। ওঁর কি কাজ আছে, আজই যেতে হবে।

স্বামীজী॥ তবে নৌকা দে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে শিষ্য ও নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

৭. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৩১-৩৫

৩১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

কাল—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরী, ১৮৯৯

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাশ্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া আসে, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের ‘উদ্বোধন’ নাম মনোনীত করেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত ‘রামকৃষ্ণ মিশনের’ সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহার সহিত ‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেনঃ

স্বামীজী॥ (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) ‘উদ্বন্ধন’ দেখেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী॥ এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য॥ কিরূপ?

স্বামীজী॥ ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী॥ তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম sacrifice (স্বার্থত্যাগ)-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success (কাজ হাসিল) করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক আছে?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর—গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী॥ কেন? পত্রের প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব-প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্ভূত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য॥ তাহা হইলেও সকলে এভাবে লইতে পারিবে না।

স্বামীজী॥ নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (সমালোচনা) গণ্য করে কাজে অগ্রসর হইনি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী॥ তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য॥ আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী॥ আমার ইচ্ছা হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দেব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি। সেটা করতে এইসব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ করে করে মরে যাবে, তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (সমালোচনা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস!

শিষ্য॥ সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী॥ আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো পুজোর কথা কিছু বললে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন, 'তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

স্বামীজী॥ তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে ‘উদ্বোধনে’র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত ‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন:

স্বামীজী॥ ‘উদ্বোধনে’ সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, ‘এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা’—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ স্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে পারলে সাধারণের মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের felling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাক-সিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তাদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিন্দুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ

হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?

তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—‘তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।’ তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। ‘উদ্বোধন’ কাগজে এইসব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি?

শিষ্য॥ আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়!

স্বামীজী॥ আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

৩২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০০

এখন স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনান্তে নীচে আসিয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা

করিতেছে। এমন সময় স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, ‘কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল?’

শিষ্য॥ মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, ‘বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামীজী আর তুই বুঝিস। আমরা কিন্তু জানি—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।’

স্বামীজী॥ তুই কি বললি?

শিষ্য॥ আমি বলিলাম. এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী, বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় ‘বৈষ্ণব’ বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামীজী॥ তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ বলে তোকে খ্যাপায়। তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, ‘আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।’

শিষ্য॥ মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামীজী॥ সর্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যক্তি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যক্তি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ-ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র ‘ঈশ্বর’ বলে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদি কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে এরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রহ্ম—জীবজগৎ থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেনঃ তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র; কিন্তু বস্তুতঃ ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ

আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয় আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্ষ-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নাম-রূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সারমর্ম। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-ফাল্গুন এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য॥ তাহা হলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামীজী॥ মন-রূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এ-জন্য নিজের personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ)-কে মানুষরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় ‘হা হতোহস্মি’ করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না! বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal God (ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের Goal (লক্ষ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মন-রূপ উপাধিতে অভিমান থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপলাভে আব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না ‘অহং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ করে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলে—তবে মানুষের আত্মজ্ঞানস্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে বলে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক, সে-ই আত্মজ্ঞানলাভে যত্নপর

হয়। সে-ই ‘নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী’—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন করে মায়ার গণ্ডী ভেঙে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না?

স্বামীজী॥ তা একবার বলতে? অন্তর্বাহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের ‘তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ’ ৫৮—এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা-ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে? সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আসিতে পারে?

স্বামীজী॥ যার ক্রমে আসে, তার আসুক। তুই তা বলে বসে থাকবি কেন? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, ‘হচ্ছে-হবে —ও-সব মেদাটে ভাব।’ পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, না, জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার করছিস।

শিষ্য॥ বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।

স্বামীজী॥ উদ্দেশ্য ও উপায়—সবই তোর হাতে। আমি কেবল stimulate (উদ্বুদ্ধ) করে দিতে পারি। এইসব সংশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ করছিস—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য॥ (অধোমুখে বিষণ্ণভাবে) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।

স্বামীজী॥ (শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহ-গেহ, জীব-জগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, স্বপ্নের মত; সর্বদা ভাববি—এই দেহটা একটা জড় যন্ত্রমাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোমার যথার্থ স্বরূপ। মন-রূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুমি তোমার স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছিস না। এই রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা তো স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটলি—মনটা শীগগীর মরে না। বীজাকারে কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে, এইরূপে যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারকালে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই উদাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামীজী॥ বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোন জিনিষ আছে? কাপুরুষেরাই ও-কথা বলে।—বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্। ৫৯ অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর। গীতা বলছেন, ‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে’ ৬০ চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হৃদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক। ঐ সংকল্পবিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তারপর ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনন্ত, কর্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্বদা দুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে—পুনরায় স্বচ্ছ হৃদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ আর একটিও না থাকে; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ’ ৬১ ইত্যাদি। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই?

স্বামীজী॥ তুমি নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুমি সর্বগ আত্মা—এটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্থূল নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূপে ‘নেতি নেতি’

করে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্ব-স্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলবি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্ব-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যৈয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে—‘ত্রিপিটিভেদ’। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি করে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতন্য, আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলে নির্দেশ করা যায় না, সেই অনির্বচনীয়-মায়াক্রিয়া-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ conscious state (চেতন বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকে শাস্ত্র superconscious state (সমাধি, সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—‘স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্’ ৬২

(গভীরভাবে মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ)

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় মগ্ন বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান—সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সত্য)। ওরা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কখনই হতে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তখনই বোধ হয় যে, আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? শাস্ত্রে যেমন বলে, ‘নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধম্’—নিত্যবস্তুরূপে ইহা স্বতঃসিদ্ধ—এইভাবেই আমি সর্বদা ইহা অনুভব করি। আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি। তোরাও দেখ, অনুভূতি কর আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে তো শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল গভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেনঃ

এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর, আর জগতে প্রচার কর। এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সারকথা বললাম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখনও বা ভক্তির, কখনও কর্মের এবং কখনও যোগের প্রাধান্য কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামীজী॥ কি জানিস—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ব্যুত্থান-কালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তাদের বলি, অভেদ-বুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথায় বলেছে। কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সংকর্ম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার ৬৪ জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য॥ মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিতা বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামীজী॥ ঐ-সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process (মন্দের গতি), দেৱীতে ফল হয়, কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন; হয়তো বিভূতিপথে মন চলে গেল, আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক বলে সর্বকালে সর্বদেশে সমান আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্য বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌঁছান যায়। আমার মতে, এই পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য॥ এইবার আমার অবতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামীজী॥ তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিষ্য॥ মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটিয়া যায় তো বারবার আর আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না।

স্বামীজী॥ যে-আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাত নেই—‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।’ আত্মাকে তো আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যন্ত। তারপর আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। অল্প লোকেই তাঁদের বুঝতে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমুদ্রে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি process-এ (উপায়) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে ‘অহং’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা ‘আত্মপর’ বলে জানবি। ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ কিনা ‘আত্মসংস্থ হও’। এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারা আত্মঘাতী। ‘বিনিহন্ত্যসদগ্রহাৎ’—রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও তো মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবি? ‘জায়স্ব ম্রিয়স্বে’র দলে যাবি? ‘শ্রেয়ঃ’কে গ্রহণ কর, ‘প্রেয়ঃ’কে পরিত্যাগ কর। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সবাইকে বলবি। বলতে বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর ‘তত্ত্বমসি’, ‘সোহমমস্মি’, ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করবি এবং হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ করলেন।

শিষ্য॥ মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই কি কর্ম থাকে?

স্বামীজী॥ জ্ঞানলাভের পর সাধারণের যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। তখন কর্ম ‘জগদ্ধিতায়’ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি ‘দেহস্থোহপি ন দেহস্থঃ’ ৬৬ —এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—‘লোকবত্ত লীলা-কৈবল্যম্।’ ৬৭

৩৩

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা প্রশংসা করিতে লাগিলেন; রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেনঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মানুষ যে জিনিষটা তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘাটি, বাটি পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরী করা উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম, মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা नीচে লেখা, 'Art unveiling nature' অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড় অবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন।

রণদাবাবু॥ আমারও ইচ্ছা আছে—সময়মত original modeling (নূতন ভাবের মূর্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামীজী॥ আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি art-এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (সমাদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শোনা যায়—এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার appreciation (সমাদর) হল!

রণদাবাবু॥ তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেকোন অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হোক কিছু কৃতকার্য হয়েছি। আশীর্বাদ করুন যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামীজী॥ যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফল) হবেন। যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) তো হয়ই, তারপর চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত লাভ হয়। যে-কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান্ তার সহায় হন।

রণদাবাবু॥ ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন?

স্বামীজী॥ প্রায় সবই সমান, originality (মৌলিকত্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ-সব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (মৌলিকত্ব) লোপ পেয়ে যায়; নিজে idea-র expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expression (বাহ্য বিকাশ)-গুলি সবই pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচছে যেন হাত পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে! গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলেদুলে তরঙ্গের মত গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প বিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশ-কল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই।

আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃবিকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

রণদাবাবু॥ আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখব, আপনার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করব।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক, একটাও চিত্রে ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা করার নেই! আমি মা-কালীর ভীমা মূর্তির কিছু idea (ভাব) ‘Kali the Mother’ (কালী দি মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা express (প্রকাশ) করতে পারেন কি?

রণদাবাবু॥ কি ভাব?

স্বামীজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজী রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেনঃ ‘The stars are blotted out’ &c. ৬৮

স্বামীজী ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া ‘বাপ’ বলিয়া ভীতচকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজী॥ কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন তো?

রণদাবাবু॥ আচ্ছা, চেষ্টা করব। ৬৯ কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী॥ ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হৃদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেনঃ

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ‘আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।’

অতঃপর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র (Drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত আঁকিয়াছিলেন; চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেনঃ

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ‘ওঁকার’ বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেঘ বন্ধুভাবে উভয়ে

উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম কর্ম বিদ্যা জ্ঞান ভক্তি—সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হউন।

রণদাবাবু এবং উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামীজীর মহত্বের কথা ভাবিয়া সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বলিলেনঃ

আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু॥ মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, ‘ছেলেটি খুব তেজস্বী।’

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—‘পরম ধন সে পরশমণি’ ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজী মুখ ধুইয়া শিষ্যসঙ্গে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ‘Encyclopedia Britannica’ পুস্তকের শিল্প-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পূর্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের চণ্ড অনুকরণ করিয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিলেন।

৩৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—মে (শেষ ভাগ), ১৯০১

স্বামীজী কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামীজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও স্বামীজীর সহাস্য বদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি সকল দুঃখ ভুলাইয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত।

শিষ্য॥ স্বামীজী, কেমন আছেন?

স্বামীজী॥ আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে-কটা দিন দেহ আছে, তাদের জন্য খাটব। খাটতে খাটতে মরব।

শিষ্য॥ আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামীজী॥ বসে থাকবার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে ‘কালী, কালী’ বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক্ দেখতে দেয় না!

শিষ্য॥ শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামীজী॥ না রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চারদিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্ট চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shock (তড়িৎ-কম্পন)-এর মত এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলাম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর স্নেহে বললেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।’ ‘আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতো শুনিতো ভাবিতে লাগিল, এ-সকল কথা সাধারণ লোকে কিভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, ‘মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?’

স্বামীজী॥ দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য॥ ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (রক্ষণশীল); উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (ধর্মোন্মাদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার photo (প্রতিকৃতি) এনে আমায় দেখালে এবং বললে, ‘মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কিনা?’ আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ‘তা বাবা, আমি কি জানি?’ তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে

বলতে হল, ‘বাবা, এখন থেকে ভাল করে খেয়ো-দেয়ো, তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।’ এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য॥ আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে।

স্বামীজী॥ গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে।

শিষ্য॥ ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ মেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। ‘হ—’র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমায় বেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য॥ শুনলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামীজী॥ হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত বেঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥টা। আমার জীবনে যে-কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমনটি হয়নি।

শিষ্য॥ মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামীজী॥ ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝিবে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে, তারাই ধন্য। শিষ্য॥ কামাখ্যা (আসাম) গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামীজী॥ শিলঙ পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন (Sir Henry Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ‘স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?’ কটন সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য॥ সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক ‘হঙ্কর’দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। ঐ ‘হঙ্কর’দেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কিনা বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, ‘মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ-মহাশয়ের মত আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।’

স্বামীজী॥ আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে Capital (রাজধানী) থেকেই ক্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদব-কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ-মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন। স্বামীজী॥ ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তাদের শাস্ত্রেই না বলছে, ‘চরেন্মাধুকরীং বৃন্তিমপি শ্লেচ্ছকুলাদপি।’ ৭০ তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্যকর) করে নেবার

জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি-নেওড়ান জলের কথা^{৭১} শুনেছিস তো? আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহা-শক্তিস্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। ‘অনুভূতি’ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বের বৃথা হল। আর আচার-বর্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের—বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গুঁড়ির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, ‘নিম্নৈশ্চৈব পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?’^{৭২} অতএব মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। তাই জানবি goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test (পরীক্ষা), কষ্টপাথর। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি, সে যে-মতের যে-পথের লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি—জীবন বৃথা। এই অনুভূতিলেভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র-টাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা। শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না। স্বামীজী॥ কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম করে এই দেহ পেয়েছিস—এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মদ্বারা কর্ম কেটে তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবনুত্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যারা জীবনুত্ত হয়েও কাজ করে, তারা জানবি—‘পরহিতায়’ কর্ম করে। তারা

ভাল-মন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাপ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ ‘পরহিতায়’ কর্ম করা একপ্রকার অসম্ভব—জানবি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ-বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে ‘জনক’ হতে চাস।

শিষ্য॥ আপনি কৃপা করুন, যাহাতে আত্মানুভূতिलाভ এ শরীরেই হয়।

স্বামীজী॥ ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, এ জন্মেই হবে; তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করে একমনে নিজের goal (লক্ষ্য)-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তো মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মত অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা আর বল—আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিষ ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—‘তত্ত্বমসি’, ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ এটি হলে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।

৩৫

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(জুন), ১৯০১

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলঙ পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুভ্রাতাগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন ও জল বন্ধ করিয়া ‘বাঁধা’ ঔষধ খাইতে হইবে। আজ রবিবার।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে। স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে ‘আর জলপান করব না’ বলে দৃঢ় সংকল্প করব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলস। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা করতে হল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেন:

মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্য তো কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযোগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজী॥ এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি? স্মৃতি-ফুতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তাদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য॥ মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্য যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রী জাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কখনও হইবে না। স্বামীজী॥ কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্টাচার্য-বামুনরা ব্রাহ্মণের জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এ-সব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না। তাদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তি-মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, ‘যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতান্তু ন পূজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥’ ৭৩ যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এ-জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া নিজের কথা নিজেই যে বদলাইতেছেন।

স্বামীজী॥ তন্ত্রের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি। ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও তো তা করি। যে

মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতরূপিণী, স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। ‘সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে’৭৪—এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিষ্য॥ আপনার উহা উত্তম সঙ্কল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামীজী॥ কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকাব্যে সহায় হবে।

শিষ্য॥ ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজী॥ জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন করব। পরে দেখবি, এক, আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর। দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শিষ্য॥ মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী॥ গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে

মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূরে থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি— অল্প-বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এসব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্তবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্য্যধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্ন ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তাদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তাদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তাদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদবেদান্ত মুখস্থ করে?

শিষ্য॥ মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না? স্বামীজী॥ তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে

শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামীজী॥ কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। এই সব বিদুষী ও কর্মতৎপর মেয়েদের বরের অভাব হবে না। ‘দশমে কন্যাকাপ্রাপ্তিঃ’—সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি দেখতে পাচ্ছিসনে?

শিষ্য॥ যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে। স্বামীজী॥ তা হোক না; তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকাজে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা ‘আমি-তুমি’র plane-এ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই; আবার মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর ‘এ স্ত্রী, ও পুরুষ’—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হতে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম—মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারও মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামীজী॥ এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখবি—এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী

বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা!—তাই এত করে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। শিষ্য॥ আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ-সংযম-তপস্যা-ব্রহ্মচর্যাदि ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামীজী॥ প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে, তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। সকল সংস্কারের প্রবর্তকেরই অভীক্ষিত কার্যানুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝলি? শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি?

স্বামীজী॥ ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে লোকের সামনে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (অস্বীকার) করবিনি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই

দোষ থাকবে। ‘সর্বরম্ভা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ’৭৫ — আগুন থাকলেই ধূম উঠবে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য॥ ভাল কাজটা কি?

স্বামীজী॥ যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ঐ আত্মজ্ঞান শীগগীর ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখনও কখনও জন্মজন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যসম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস? সে তোর সঙ্গে থাকবেই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে? স্বামীজী॥ আচার্য শঙ্কর ঐরূপ বলে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎ কর্ম হবে; তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য॥ আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামীজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতে বলিলেন। শিষ্যও যাইবার পূর্বে স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, ‘মহাশয়, আপনার স্নেহশীর্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।’ শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী! এই এক নূতন ঢঙ।

৩১

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল—(৩য় সপ্তাহ) জানুআরী, ১৮৯৯

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাশ্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া আসে, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের ‘উদ্বোধন’ নাম মনোনীত করেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত ‘রামকৃষ্ণ মিশনের’ সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহার সহিত ‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেনঃ

স্বামীজী॥ (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) ‘উদ্বন্ধন’ দেখেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ, সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী॥ এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য॥ কিরূপ?

স্বামীজী॥ ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী॥ তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম sacrifice (স্বার্থত্যাগ)-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success (কাজ হাসিল) করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক আছে?

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর—গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী॥ কেন? পত্রের প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব-প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাণ্ডক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-

স্বাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্ভূত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য॥ তাহা হইলেও সকলে এভাবে লইতে পারিবে না।

স্বামীজী॥ নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (সমালোচনা) গণ্য করে কাজে অগ্রসর হইনি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী॥ তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য॥ আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী॥ আমার ইচ্ছা হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দেব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি তোদের এখনও হয়নি। সেটা করতে এইসব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ করে করে মরে যাবে, তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (সমালোচনা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস!

শিষ্য॥ সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী॥ আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো পূজোর কথা কিছু বললে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন, ‘তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।’

স্বামীজী॥ তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে ‘উদ্বোধন’র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত ‘উদ্বোধন’ পত্র সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা করিয়াছিলেনঃ

স্বামীজী॥ ‘উদ্বোধন’ সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতি-বাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, ‘এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা’—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ স্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে পারলে সাধারণের মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের felling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাক-সিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তাদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত

হিন্দুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?

তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—‘তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই।’ তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। ‘উদ্বোধন’ কাগজে এইসব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি?

শিষ্য॥ আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়!

স্বামীজী॥ আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

৩২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০০

এখন স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনান্তে নীচে আসিয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এমন সময় স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, ‘কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল?’

শিষ্য॥ মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, ‘বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামীজী আর তুই বুঝিস। আমরা কিন্তু জানি—কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।’

স্বামীজী॥ তুই কি বললি?

শিষ্য॥ আমি বলিলাম. এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী, বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় ‘বৈষ্ণব’ বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামীজী॥ তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ বলে তোকে খ্যাপায়। তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, ‘আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।’

শিষ্য॥ মহাশয়, উপনিষদে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামীজী॥ সর্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যক্তি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যক্তি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ-ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র ‘ঈশ্বর’ বলে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদি কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে একরূপ যেন মনে করিসনি যে, ব্রহ্ম—জীবজগৎ থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেনঃ তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজগৎ

অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র; কিন্তু বস্তুতঃ ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয় আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নাম-রূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সারমর্ম। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-ফাল্গুন এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য॥ তাহা হলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামীজী॥ মন-রূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধরতে বুঝতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এ-জন্য নিজের personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ)-কে মানুষরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় 'হা হতোহস্মি' করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না! বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে যে-ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal God (ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের Goal (লক্ষ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মন-রূপ উপাধিতে অভিমান থাকায় সে হরেক রকম সন্দেহ-সংশয় সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপলাভে আব্রহ্মাস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ করে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলে—তবে মানুষের আত্মজ্ঞানসম্পূর্ণ বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে বলে মনে যার

সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর স্থির শান্ত সমনস্ক, সে-ই আত্মজ্ঞানলাভে যত্নপর হয়। সে-ই ‘নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী’—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন করে মায়ার গণ্ডী ভেঙে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না?

স্বামীজী॥ তা একবার বলতে? অন্তর্বাহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের ‘তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ’ ৫৮—এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন, লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা-ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে? সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।

শিষ্য॥ কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আসিতে পারে?

স্বামীজী॥ যার ক্রমে আসে, তার আসুক। তুই তা বলে বসে থাকবি কেন? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, ‘হচ্ছে-হবে —ও-সব মেদাটে ভাব।’ পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে, না, জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার করছিস।

শিষ্য॥ বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্বস্ব-ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।

স্বামীজী॥ উদ্দেশ্য ও উপায়—সবই তোর হাতে। আমি কেবল stimulate (উদ্বুদ্ধ) করে দিতে পারি। এইসব সংশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ করছিস—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য॥ (অধোমুখে বিষণ্ণভাবে) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন, আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।

স্বামীজী॥ (শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া) ভয় কি? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহ-গেহ, জীব-জগৎ সকলই নিঃশেষ মিথ্যা, স্বপ্নের মত; সর্বদা ভাববি—এই দেহটা একটা জড় যন্ত্রমাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোমার যথার্থ স্বরূপ। মন-রূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তারপর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুমি তোমার স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছিস না। এই রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা তো স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটলি—মনটা শীগগীর মরে না। বীজাকারে কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে, এইরূপে যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারকালে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই উদাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামীজী॥ বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোন জিনিষ আছে? কাপুরুষেরাই ও-কথা বলে।—বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্। ৫৯ অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর। গীতা বলছেন, ‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে’। ৬০ চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হৃদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক। ঐ সংকল্পবিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তারপর ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। আবার কর্মও যেমন অনন্ত, কর্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত অযুত কর্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্বদা দুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে—পুনরায় স্বচ্ছ হৃদে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ আর একটিও না থাকে; তবেই ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ’ ৬১ ইত্যাদি। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই?

স্বামীজী॥ তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বগ আত্মা—এটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, স্থূল নই, সূক্ষ্ম নই—এইরূপে ‘নেতি নেতি’ করে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্ব-স্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলবি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্ব-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যৈয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই শাস্ত্রে বলে—‘ত্রিপিটিভেদ’। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি করে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতন্য, আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলে নির্দেশ করা যায় না, সেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্তি-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ conscious state (চেতন বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত-সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকে শাস্ত্র superconscious state (সমাধি, সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—‘স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহী নম্’ ৬২

(গভীরভাবে মগ্ন হইয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ)

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় মগ্ন বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান—সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সত্য)। ওরা সেজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কখনই হতে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তখনই বোধ হয় যে, আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? শাস্ত্রে যেমন বলে, ‘নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধম্’—নিত্যবস্তুরূপে ইহা স্বতঃসিদ্ধ—এইভাবেই আমি সর্বদা ইহা অনুভব করি। আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি, অনুভূতি করেছি। তোরাও দেখ, অনুভূতি কর আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে তো শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেনঃ

এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর, আর জগতে প্রচার কর। এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সারকথা বললাম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখনও বা ভক্তির, কখনও কর্মের এবং কখনও যোগের প্রাধান্য কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামীজী॥ কি জানিস—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ব্যুত্থান-কালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তাদের বলি, অভেদ-বুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথায় বলেছে। কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সংকরম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার৬৪ জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা।

শিষ্য॥ মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিতা বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামীজী॥ ঐ-সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process (মন্দের গতি), দেৱীতে ফল হয়, কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন; হয়তো বিভূতিপথে মন চলে গেল, আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক বলে সর্বকালে সর্বদেশে

সমান আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্য বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌঁছান যায়। আমার মতে, এই পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য॥ এইবার আমার অবতারবাদ-বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামীজী॥ তুই যে একদিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিষ্য॥ মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটিয়া যায় তো বারবার আর আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না।

স্বামীজী॥ যে-আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাত নেই—‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।’ আত্মাকে তো আর জানা যায় না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানব-বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যন্ত। তারপর আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। অল্প লোকেই তাঁদের বুঝতে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমুদ্রে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি process-এ (উপায়) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে ‘অহং’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা ‘আত্মপর’ বলে জানবি। ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ কিনা ‘আত্মসংস্থ হও’। এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাি আত্মঘাতী। ‘বিনিহন্ত্যসদগ্রহাৎ’—রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও তো মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা করতে পারবিনি? ‘জায়স্ব ম্রিয়স্বে’র দলে যাবি? ‘শ্রেয়ঃ’কে গ্রহণ কর, ‘প্রেয়ঃ’কে পরিত্যাগ কর। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সবাইকে বলবি। বলতে বলতে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর ‘তত্ত্বমসি’, ‘সোহমমস্মি’, ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ প্রভৃতি মহামন্ত্র

সর্বদা উচ্চারণ করবি এবং হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ করলেন।

শিষ্য॥ মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই কি কর্ম থাকে?

স্বামীজী॥ জ্ঞানলাভের পর সাধারণের যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। তখন কর্ম ‘জগদ্ধিতায়’ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই জীবের কল্যাণসাধণ করে। ঠাকুরকে দেখেছি ‘দেহস্থোহপি ন দেহস্থঃ’ ৬৬ —এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—‘লোকবত্ত লীলা-কৈবল্যম্।’ ৬৭

৩৩

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—১৯০১

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা প্রশংসা করিতে লাগিলেন; রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁর একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামীজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেনঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই

বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মানুষ যে জিনিষটা তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরী করা উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম, মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা, 'Art unveiling nature' অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড় অবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন।

রণদাবাবু॥ আমারও ইচ্ছা আছে—সময়মত original modeling (নূতন ভাবের মূর্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামীজী॥ আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি art-এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (সমাদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শোনা যায়—এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়তো তার appreciation (সমাদর) হল!

রণদাবাবু॥ তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হোক কিছু কৃতকার্য হয়েছি। আশীর্বাদ করুন যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামীজী॥ যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফল) হবেন। যে যে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) তো হয়ই, তারপর

চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত লাভ হয়। যে-কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে ভগবান তার সহায় হন।

রণদাবাবু॥ ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাত কি দেখলেন?

স্বামীজী॥ প্রায় সবই সমান, originality (মৌলিকত্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ-সব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (মৌলিকত্ব) লোপ পেয়ে যায়; নিজে idea-র expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন; এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expression (বাহ্য বিকাশ)-গুলি সবই pointed (তীব্র, তীক্ষ্ণ); নাচছে যেন হাত পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে! গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলেদুলে তরঙ্গের মত গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প বিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে

নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশ-কল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যৈয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃবিকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

রণদাবাবু॥ আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখব, আপনার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করব।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ

এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক, একটাও চিত্রে ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই! আমি মা-কালীর ভীমা মূর্তির কিছু idea (ভাব) ‘Kali the Mother’ (কালী দি মাদার) নামক ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা express (প্রকাশ) করতে পারেন কি?

রণদাবাবু॥ কি ভাব?

স্বামীজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজী রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেনঃ ‘The stars are blotted out’ &c. ৬৮

স্বামীজী ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া ‘বাপ’ বলিয়া ভীতচকিতনয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজী॥ কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন তো?

রণদাবাবু॥ আচ্ছা, চেষ্টা করবা। ৬৯ কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী॥ ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হৃদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেনঃ

চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ‘আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।’

অতঃপর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র (Drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত আঁকিয়াছিলেন; চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেনঃ

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করবা। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে,

নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ‘ওঁকার’ বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেঘ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম কর্ম বিদ্যা জ্ঞান ভক্তি—সমস্তই যাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হউন।

রণদাবাবু এবং উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামীজীর মহত্ত্বের কথা ভাবিয়া সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বলিলেনঃ

আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু॥ মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামীজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, ‘ছেলেটি খুব তেজস্বী।’

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—‘পরম ধন সে পরশমণি’ ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীজী মুখ ধুইয়া শিষ্যসঙ্গে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ‘Encyclopedia Britannica’ পুস্তকের শিল্প-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাজ হইলে পূর্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢঙ অনুকরণ করিয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিলেন।

৩৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—মে (শেষ ভাগ), ১৯০১

স্বামীজী কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামীজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও স্বামীজীর সহাস্য বদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি সকল দুঃখ ভুলাইয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত।

শিষ্য॥ স্বামীজী, কেমন আছেন?

স্বামীজী॥ আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে-কটা দিন দেহ আছে, তাদের জন্য খাটব। খাটতে খাটতে মরব।

শিষ্য॥ আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামীজী॥ বসে থাকবার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে ‘কালী, কালী’ বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের সুখের দিক্ দেখতে দেয় না!

শিষ্য॥ শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামীজী॥ না রে। ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চারদিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্ট চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shock (তড়িৎ-কম্পন)-এর মত এসে আমার শরীরে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলাম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর স্নেহে বললেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলাম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।’ ‘আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয়নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতো শুনিতো ভাবিতে লাগিল, এ-সকল কথা সাধারণ লোকে কিভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, ‘মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?’

স্বামীজী॥ দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখলুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য॥ ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (রক্ষণশীল); উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (ধর্মোন্মাদ) হয়ে

পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার photo (প্রতিকৃতি) এনে আমায় দেখালে এবং বললে, ‘মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কিনা?’ আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ‘তা বাবা, আমি কি জানি?’ তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, ‘বাবা, এখন থেকে ভাল করে খেয়ো-দেয়ো, তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।’ এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য॥ আমাদের পূর্ববাঙলায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে।

স্বামীজী॥ গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা ইচ্ছা তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে।

শিষ্য॥ ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ মেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। ‘হ—’র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমায় রঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য॥ শুনলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামীজী॥ হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখব না? নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রঁধে খাওয়ালেন! বাড়ীখানি কি মনোরম—যেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নিয়েছিলুম। তারপর, এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥টা। আমার জীবনে যে-কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ-মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহর। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ-মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও—যেমন হওয়া উচিত, তেমনটি হয়নি।

শিষ্য॥ মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামীজী॥ ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝিবে? যারা তাঁর সঙ্গে পেয়েছে, তারাই ধন্য। শিষ্য॥ কামাখ্যা (আসাম) গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামীজী॥ শিলঙ পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন (Sir Henry Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ‘স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?’ কটন সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য॥ সেখানকার ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামীজী॥ তন্ত্রপ্রধান দেশ। এক ‘হঙ্কর’দেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। ঐ ‘হঙ্কর’দেব শঙ্করাচার্যেরই নামান্তর কিনা বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিম্বা শঙ্করাচার্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, ‘মহাশয়, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ-মহাশয়ের মত আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।’

স্বামীজী॥ আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল-চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও-অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে Capital (রাজধানী) থেকেই ক্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদব-কায়দার বিস্তার হয়। ও-দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ-মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন। স্বামীজী॥ ও-দেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—ওটা

কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তাদের শাস্ত্রেই না বলছে, ‘চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।৭০ তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্যকর) করে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি-নেওড়ান জলের কথা৭১ শুনেছিস তো? আচার-বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহা-শক্তিস্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধিনিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। ‘অনুভূতি’ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বের বৃথা হল। আর আচার-বর্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের—বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করও বলেছেন, ‘নিম্নেগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?৭২ অতএব মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। তাই জানবি goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test (পরীক্ষা), কষ্টীপাথর। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি, সে যে-মতের যে-পথের লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে তো জানবি—জীবন বৃথা। এই অনুভূতিলেভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র-টাস্ত্র তো ঢের পড়লি। বল দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস। উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে চলে যা। শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামীজী॥ কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম করে এই দেহ পেয়েছিস—এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে কর্মদ্বারা কর্ম কেটে তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জানবি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জানবি—‘পরহিতায়’ কর্ম করে। তারা ভাল-মন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ ‘পরহিতায়’ কর্ম করা একপ্রকার অসম্ভব—জানবি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ-বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে ‘জনক’ হতে চাস।

শিষ্য॥ আপনি কৃপা করুন, যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামীজী॥ ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, এ জন্মেই হবে; তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করে একমনে নিজের goal (লক্ষ্য)-এর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার তো পশু-পক্ষীরাও করছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে তো মরতে বসেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মত অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা আর বল—আমি অভয়-পদ পেয়েছি। বল—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিষ ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—‘তত্ত্বমসি’, ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ এটি হলে তবে জানব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(জুন), ১৯০১

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলঙ পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুভ্রাতাগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন ও জল বন্ধ করিয়া ‘বাঁধা’ ঔষধ খাইতে হইবে। আজ রবিবার।

শিষ্য॥ মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া আপনার অসহ্য হইবে। স্বামীজী॥ তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে ‘আর জলপান করব না’ বলে দৃঢ় সংকল্প করব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলস। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা করতে হল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিতেছেন:

মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরী হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্য তো কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযোগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজী॥ এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা

মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি? স্মৃতি-ফুটি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তাদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য॥ মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্য যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রী জাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কখনও হইবে না। স্বামীজী॥ কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্টাচার্য-বামুনরা ব্রাহ্মণের জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এ-সব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না। তাদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, ‘যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতান্তু ন পূজ্যন্তে সর্বান্তত্ৰাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥’৭৩ যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এ-জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া নিজের কথা নিজেই যে বদলাইতেছেন।

স্বামীজী॥ তন্ত্রের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি।

ভগবতীজ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতরূপিণী, স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। ‘সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে’৭৪—এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিষ্য॥ আপনার উহা উত্তম সঙ্কল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামীজী॥ কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকাব্যে সহায় হবে।

শিষ্য॥ ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজী॥ জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন করব। পরে দেখবি, এক, আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর। দেখবি, কালে এর

প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শিষ্য॥ মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী॥ গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূরে থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি— অল্প-বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এসব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্তবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্ন ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবধর্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হলে তবে তো তাদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তাদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস। মেয়েদের ঐ দুর্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তাদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদবেদান্ত মুখস্থ করে?

শিষ্য॥ মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না? স্বামীজী॥ তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ-সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামীজী॥ কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝতে পারিসনি। এই সব বিদুষী ও কর্মতৎপর মেয়েদের বরের অভাব হবে না। ‘দশমে কন্যাকাপ্রাপ্তিঃ’—সে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি দেখতে পাচ্ছিসনে?

শিষ্য॥ যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে। স্বামীজী॥ তা হোক না; তাতে ভয় কি? সংসাহসে অনুষ্ঠিত সংকাজে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা ‘আমি-তুমি’র plane-এ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই; আবার মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর ‘এ স্ত্রী, ও পুরুষ’—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হতে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম—মেয়েদের

মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারও মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামীজী॥ এখনি কি খুলেছে? যখন সর্বাভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখবি—এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা!—তাই এত করে তাদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। শিষ্য॥ আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ-সংযম-তপস্যা-ব্রহ্মচর্যাदि ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামীজী॥ প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত-উদ্‌যাপন—এজন্য শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে, তাইতেই তুই যে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। সকল সৎকার্যের প্রবর্তকেরই অভীক্ষিত কার্যানুষ্ঠানের পূর্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝলি? শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল-নাটক

পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি?

স্বামীজী॥ ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে লোকের সামনে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (অস্বীকার) করিনি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাকবে। ‘সর্বরম্ভা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ’৭৫ —আগুন থাকলেই ধূম উঠবে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে? যতটা পারিস, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য॥ ভাল কাজটা কি?

স্বামীজী॥ যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ঐ আত্মজ্ঞান শীগগীর ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখনও কখনও জন্মজন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যসম্ভাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস? সে তোর সঙ্গে থাকবেই।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, আচার্য শঙ্করের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে? স্বামীজী॥ আচার্য শঙ্কর ঐরূপ বলে আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ

উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎ কর্ম হবে; তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য॥ আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামীজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতে বলিলেন। শিষ্যও যাইবার পূর্বে স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, ‘মহাশয়, আপনার স্নেহশীর্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।’ শিষ্যের মন্তকে হাত দিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী! এই এক নূতন ঢঙ।

৮. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৩৬-৪০

৩৬

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(জুন?), ১৯০১

স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। আজ ৫।৭ দিন যাবৎ স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এই ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে। শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, ‘আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ রবিবার, তার উপর স্বামীজী অসুস্থ—শুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।’ শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ ফেলিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনমানসে উপরে গেল। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী সন্মোহে বলিলেন, ‘এসেছিস? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম।’

শিষ্য॥ শুনলাম, শুধু দুধমাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ-সাত দিন আছেন?

স্বামীজী॥ হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত অনুরোধে কবিরাজী ঔষধ খেতে হল। ওদের কথা তো এড়াতে পারিনে।

শিষ্য॥ আপনি তো ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন? স্বামীজী॥ যখন শুনলুম এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য॥ ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে তো?

স্বামীজী॥ উপকার অপকার—জানিনে। গুরুভাইদের আজ্ঞাপালন করে যাচ্ছি।

শিষ্য॥ দেশী কবিরাজী ঔষধ বোধ হয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

স্বামীজী॥ আমার মত কিন্তু একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানবিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে)—যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়। এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য ঠাকুরের ভোগের জন্য একটা বড় মাছ আনিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামীজী বলিলেন, ‘চল, কেমন মাছ দেখব।’

অনন্তর স্বামীজী একটা গরম জামা পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ‘আজই ভাল করে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।’ স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, ‘রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যো।’ তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, ‘ভক্তের আনীত দ্রব্য শনিবার-রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।’ স্বামী প্রেমানন্দ আর আপত্তি না করিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্ত্বেও ঠাকুরকে মৎস্যভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া দিয়া স্বামীজী ইংরেজী ধরনে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের সকলে তাঁহাকে রাঁধিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া দুধ ভারমিসেলি দধি প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় স্বামীজী ঐ-সকল মাছের তরকারি আনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, ‘বাঙাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ দেখি কেমন রান্না হয়েছে।’ ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ-সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন হয়েছে?’ শিষ্য বলিল, ‘এমন কখনও খাই নাই।’ তাহার প্রতি স্বামীজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভারমিসেলি (vermicelli) শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। ইহা কি পদার্থ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, ‘ওগুলি বিলিতি কেঁচো। আমি লগুন থেকে শুকিয়ে এনেছি।’ মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামীজীর এখন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার-অনিদ্রাতেও স্বামীজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল মঠে নূতন Encyclopaedia Britannica (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা) ক্রয় করা হইয়াছে। নূতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামীজীকে বলিল, ‘এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।’ শিষ্য তখন জানে না যে, স্বামীজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামীজী॥ কি বলছিস? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সব বলে দেব। শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?

স্বামীজী॥ না পড়লে কি বলছি?

অনন্তর স্বামীজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ-সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম তো বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই-একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামীজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, ‘ইহা মানুষের শক্তি নয়!’

স্বামীজী॥ দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য॥ আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্যরক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির স্ফুরণ কখনই সম্ভব না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামীজী আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়সকলের বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্যই যেন আজ তিনি ঐগুলি ঐরূপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, ‘তুই তো বেশ! স্বামীজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্পসল্প করে স্বামীজীর মন প্রফুল্ল রাখবি, তা না তুই কিনা ঐ-সব জটিল কথা তুলে স্বামীজীকে বকাচ্ছিস!’ শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, ‘নে, রেখে দে তোদের কবিরাজী নিয়ম-ফিয়ম। এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় তো বয়ে গেল।’

শিষ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া বাঙালদেশীয় কথা লইয়া হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। স্বামীজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রথম হইতে স্বামীজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ‘ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।’ পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন:

ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। ‘মেঘনাদবধে’র মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাডম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ—লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই ‘মেঘনাদবধকাব্য’—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা ‘ছুঁচোবধকাব্য’ লেখা হল! তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি? সেই ‘মেঘনাদবধকাব্য’ এখনও হিমাচলের মত অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে-সব critic (সমালোচক)-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায়

যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে? এই যে জি.সি. কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তাদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticize (সমালোচনা) করছে—দোষ ধরছে! জি.সি. কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোকে ঐসব বই appreciate (আদর) করবে।

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, ‘যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য-খানা নিয়ে আয়।’ শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে ‘মেঘনাদবধকাব্য’ লইয়া আসিলে বলিলেন, ‘পড় দিকি—কেমন পড়তে জানিস?’

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামীজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বল দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট?’

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মূহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। ‘যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক’—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামীজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত—জাগরুক রহিয়াছে।

৩৭

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

স্বামীজীর অসুখ এখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

আজ দুই দিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামীজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য নির্ভয়ানন্দ-স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, যে আত্মা সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুসৃত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?’

স্বামীজী॥ তোর যে চোখ আছে, তা কি তুই জানিস? যখন কেউ চোখের কথা বলে, তখন ‘আমার চোখ আছে’ বলে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোখে বালি পড়ে যখন চোখ করকর্ করে, তখন চোখ যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। এইজন্য দুঃখ আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মত যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই, যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ-সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্য জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা যত নিকটে, তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং ‘আমিই সেই আত্মা’, ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ প্রভৃতি বেদের মহাকাব্য-সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখকষ্ট-তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কেন? সৃষ্টি না হইলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই তো এককালে ব্রহ্মে বর্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই৭৬ বা কেন? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণসঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন?

স্বামীজী॥ লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝতে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি-ফিষ্টি যা কিছু দেখছিস, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ-সব প্রশ্নই থাকবে না। শিষ্য॥ মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই?

স্বামীজী॥ থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে ‘আমি আমি’ করছিস, ততক্ষণ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ আত্মরতি আত্মক্ৰীড়, তখন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; সৃষ্টি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আছে কিনা—এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাকবে না। তখন তোকে বলতে হবে—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥৭৭

শিষ্য॥ জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে ‘কুত্র লীনমিদং জগৎ’ কথাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? স্বামীজী॥ ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে, তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই, সে কেবলমাত্র ‘অবাণ্ড মনসোগোচরম্’ ব্রহ্মের আছে। বল, তোর আর কি বলবার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেব।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘ঠাকুরঘরে গেলিনি?’

শিষ্য॥ আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামীজী॥ তবে থাক।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ‘আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।—আজ কালীপূজার দিন।’ স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, ‘দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!’ কথা কয়টি বলিয়া সেই গম্ভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তব-মাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামীজীর এই অদৃষ্টপূর্ব গান্ধীর্ষ ও গাঢ় তিমিরাবগুণে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থির ভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আন্তে আন্তে গাহিতে লাগিলেন:

‘নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥’

গীত সাক্ষ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ‘মা, মা, কালী, কালী’ বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আঙুঠাপালনের জন্য অবস্থান করিতেছে।

স্বামীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন এখনও কোন এক দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, ‘মহাশয়, এইবার কথাবার্তা বলুন।’

স্বামীজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য ও গান্ধীর্ষ কত দূর বল দিকি?’

শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক্ অবগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, ‘মহাশয়, ও-সব কথার এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল!’

স্বামীজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন:

‘কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
—কালী সুধা-তরঙ্গিণী॥’

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন:

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, ‘সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব’—
শুনিসনি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো করব! রঘুনন্দন বলেছেন, ‘নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দমম্’—এবার তাই করব। মাকে বুকুর রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মা-র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজী শুনিয়া বলিলেন, ‘যা, নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগগীর আসিস।’

৩৮

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

স্বামীজী আজকাল মঠেই আছেন। শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

স্বামীজী॥ এ শরীরের তো এই অবস্থা! তোরা তো কেউই আমার কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না। আমি একা কি করব বল? বাঙলা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ-কর্ম চলতে পারে? তোরা সব এখানে আসিস—শুদ্ধ আধার, তোরা যদি আমার এইসব কাজে সহায় না হস তো আমি একা কি করব বল? শিষ্য॥ মহাশয়, এইসকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন; তথাপি আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী॥ কি জানিস, আমি চাই a band of Young Bengal (একদল যুবক বাঙালী); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আত্মানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব 'তমো'পূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?

স্বামীজী॥ যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-যশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তারপর বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও তো কার্যক্ষেত্রে সে-সকল এখনও বিকাশ করতে পারছিস না। এইসব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ করে কোন কাজই করে যেতে পারলুম না। অবশ্য এখনও একেবারে

হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর বেরুতে পারে—যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।

শিষ্য॥ আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ়ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চা, কি ব্রহ্মচর্য—সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্য করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজী॥ আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last infirmity of noble mind (যশের আকাঙ্ক্ষাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ দুর্বলতা)—পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল-মন্দ—লোকে দুই তো বলবেই, কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে ‘নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্তু’ (পণ্ডিত ব্যক্তির নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক)।

শিষ্য॥ আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামীজী॥ মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ না, রামের আঙুয় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃকপাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আঙুপালন আর ব্রহ্মচর্য-রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (সফল হবার একমাত্র রহস্য); ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়’ (এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসম্বাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শিশু রঘুনাথের

আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল-করতাল বাজিয়ে লক্ষ্যবাম্প করে দেশটা উৎসর্গে গেল। একে তো এই dyspeptic (অজীর্ণ) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে-ঝাঁপালে সহিবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ-সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, ‘মহাবীর, মহাবীর’ ধ্বনিতে এবং ‘হর হর ব্যোম্ ব্যোম্’ শব্দে দিগদেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব music-এ (গীতবাদ্য) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্ড্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ-ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস, ideal (আদর্শ) থেকে কখনও যেন এক পাও হটিসনি। কখনও সাহসহীন হবিনি। খেতে-শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সংসাহসের পরিচয় দিবি। তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।

স্বামীজী॥ তখন এইরূপ ভাববি—‘আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!’ হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে ‘আমি বীর্যবান্, মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্’ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। ‘আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী’—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, ‘এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।’ এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হলে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে

আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা তখনই চলে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়ে বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া তিনি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিসনে?—এই—এই!

এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে ‘চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্হে!’—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী ‘এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম’ বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল, একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।’ স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার ‘আমি-আমার’ রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামীজী বেড়াইতে গেলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, ‘দেখলি, আজ কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখনই তখনই অনুভূতি হয়ে গেল।’

শিষ্য॥ মহাশয়, আমাদের মত লোকের মনও যখন নির্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীজী॥ সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর। এই মহামোহগ্রস্থ জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। শিষ্য॥ মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে ‘গহনা কর্মণো গতিঃ।’

স্বামীজী॥ তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য॥ আপনার মত সর্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় যেন অন্য কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই। স্বামীজী॥ ভাল লাগে তো তাই করে যা। আর তোর সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, তা হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে তো কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হতে পারে। ঐ-সব লিপিবদ্ধ করে যা। এতে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য॥ অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, চাপরাস না পেলে কেহ কাহারও কথা লয় না।

স্বামীজী॥ তুই যে-সব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা ঐ stage (অবস্থা)-এ পড়ে আছে; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হলে তাদেরও তো উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে-সব চর্চা করিস, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখলে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য॥ আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামীজী॥ যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্থ জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডী থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, ততকাল তাকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই

অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তোর এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

শিষ্য॥ এটি তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামীজী॥ এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে। তাঁরা বলেন ‘ব্যক্তিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নয়, সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।’ অবশ্য ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।

শিষ্য॥ বেদান্তমতে ব্যষ্টিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কামকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে, নির্বিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি বলে মন নিরূপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিতত্ত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামীজী॥ হাঁ, তুই যা বলছিস, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অপরূপ হয় না। কিন্তু যে মনে করে—আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণটা একবার ভেবে দেখ দেখি।

শিষ্য॥ মহাশয়, উহা উদারভাবে পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্যমনে কোন বিষয় ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, ‘ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল?’ যেন পূর্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! শিষ্য ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামীজী বলিলেন, ‘দিনরাত ব্রহ্মবিষয়ের অনুধ্যান করবি। একান্তমনে ধ্যান

করবি। আর ব্যুৎপানকালে হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি—জীবের, জগতের উপকার হোক, সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক। ঐরূপ ধারাবাহিক চিন্তাতরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা সেটি কাজই হোক, আর চিন্তাই হোক। তোর চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয়তো আমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে।’

শিষ্য॥ মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্বিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন—এই জন্মেই যেন তাহা হয়।

স্বামীজী॥ তা হবে বৈকি। ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয় হবে।

শিষ্য॥ আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন—সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

ঐরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামীজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎস্নার রজতধারায় মঠের উদ্যান যেন প্লাবিত হইতেছিল।

৩৯

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০১

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামীজী কখনও কখনও ঐ-সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, ‘হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার॥’৮০ কখনও বলিতেন, ‘দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার সময় তার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম-

সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।’ আবার কখনও বলিতেন, ‘Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।’ সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামীজী তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন, কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, ‘ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে।’ স্বামীজীর শ্রীমুখে এ-কথাও সর্বদা শুনা যাইত, ‘ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।’

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বে কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেনঃ ওরে, একখানা রঘুনন্দনের ‘অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব’ শীগগীর আমার জন্যে নিয়ে আসবি।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজী॥ কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তাঁর তৈরী হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে, খেতে-শুতে, অন্য সকল বিষয়ের তো কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হতে পারল না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তন হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য॥ আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজী॥ এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পূজো করব। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবার যখন আসবি, তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবি।

শিষ্য॥ যে আজ্ঞা।

পরের রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত ‘অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব’ ক্রয় করিয়া স্বামীজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল। গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া চার পাঁচ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেনঃ তোমার দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি তো এবার মার পূজো করব। রঘুনন্দন বলেছেন, ‘নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্’—মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব।

* *

স্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা হইবে। কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক হইলেন। যে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া স্বামীজী একদিন গান গাহিয়া-ছিলেন, ‘বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন’—সেইখানেই বোধনাধিবাসের সাক্ষ্যপূজা সম্পন্ন হইল। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া পশুবলিদান হয় নাই। গরীব-দুঃখীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সানন্দে পূজায় যোগদান করেন এবং পূজা দর্শন করিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

মহাষ্টমীর পূর্বরাত্রে স্বামীজীর জ্বর হওয়ার পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। নবমীরাত্রে

শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন। পূজা-শেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল। দুর্গাপূজার পর মঠে লক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত্র নির্বাহিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছায় বাল্যকালের এক ‘মানত’ পূজা সম্পন্ন করিতে কালীঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নানান্তে ভিজা-কাপড়ে মায়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। মায়ে পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। এই-সকল কথা বলিবার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি; বরং পরম সমাদরে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেষ্ট পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।’

বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী আচার্য শঙ্করের মত পূজানুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী ছিলেন।

৪০

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—মার্চ, ১৯০২১

আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহামহোৎসব—এই উৎসবই স্বামীজী শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামীজী মেজেতে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও

মস্তকে স্পর্শ করিলে এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, ‘খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারি টাটিয়েছে।’ শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামীজী হষ্টচিত্তে বলিলেন, ‘বেশ হয়েছে।’

স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ (শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া) কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু-কিছুও যদি ঢুকতে পেরে থাকি, তাহলেই জানব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।

শিষ্য॥ আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামীজী॥ সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহার ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না—ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামীজী॥ ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস ‘কালেনাঅনি বিন্দতি’—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, ‘মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দিন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।’

স্বামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে হইল, তিনি যেন দূরদৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ‘লোকের গুলতোন দেখে কী আর হবে? আজ আমার কাছে

থাক। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।' শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও সকল কার্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

অনন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামীজীর কাছে আসিল। মনের সাধে আজ স্বামীজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল! স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামীজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাস্যমুখে তাহার প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্য-ভাবে হয় তো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন হয়তো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন Question-Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পরদিন চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হল। দুর্গাপূজা যেমন চার দিন ধরে হয়, তেমনি। ঐরূপে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই যে ঠাকুরের ভাব খুব প্রচার হল, তা তো নয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, ইহা আপনার সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

স্বামীজী॥ আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ও-সব করিস।

শিষ্য॥ মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণিত ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ তোরা হচ্ছিস ঠাকুরের লীলার actors (অভিনেতা)। এর পরে আমাদের কথা তো ছেড়েই দে, লোকে তোদেরও নাম করবে। এই যে-সব স্তব লিখচ্ছিস, এর পর লোকে ভক্তিমুক্তি-লাভের জন্য এইসব স্তব পাঠ করবে। জানবি, আত্মজ্ঞানলাভই পরম সাধন। অবতারপুরুষরূপী জগদ্গুরুর প্রতি ভক্তি হলেই ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিষ্য॥ (অবাক হইয়া) মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞান লাভ হইবে তো? স্বামীজী॥ ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না।

শিষ্য॥ (বিষণ্ণ ও চিন্তিত ভাবে) আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।

স্বামীজী॥ ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে। শিষ্য॥ (স্বামীজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।

স্বামীজী॥ কে কার উদ্ধার করতে পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জোতিষ্মান হয়ে সূর্যের মত প্রকাশ পান।

শিষ্য॥ তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনিতে পাই কেন?

স্বামীজী॥ কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিছুদূর পর্যন্ত radius (ব্যাসার্ধ) নিয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle-এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয় অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস তো বল।

শিষ্য॥ এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি, মহাশয়?

স্বামীজী॥ তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত মুমুক্শু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত করে দেওয়া কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝলি? শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যাহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি?

স্বামীজী॥ তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় এবং তাঁর কৃপা পায়।

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন কি?

স্বামীজী॥ ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গে করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বলত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হত না; জানিস তো আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিস্তর ফলত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটি ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিলত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে তাঁকে খুব ভাল লাগল। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। ঐর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন করব। জানিস তো আমার বাঙালের মত রোক। যা মনে করব, তা করবই। যে দিন দীক্ষা নেব মনে করেছি, তার আগের রাতে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু করব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধহয় ২।৩ ঘণ্টা গত হল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখতে হল। দু-এক দিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সেদিন রাতেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হল—ঠিক আগের দিনের মত। এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের

দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হল, যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না।

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?

স্বামীজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বলিলেনঃ ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! ‘কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।’ তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন তোরা এখানকার লোক। ‘রামকৃষ্ণ’ নাম ধরে কে যে এসেছিলেন, কেউ চিনলে না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সান্ধোপাঙ্গ—এরাও তাঁর ঠাণ্ডার পায়নি। কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবে। এই যে রাখাল-টাখাল যারা তাঁর এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যায়। অন্যের কথা আর কি বলব!

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে এসেছে?’ তিনি বলিলেন, ‘ভগিনী নিবেদিতা ও অপর দু-চার জন ইংরেজ মহিলা।’ শিষ্যের মুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, ‘ঐ আলখাল্লাটা দে তো।’ শিষ্য উহা আনিয়া দিলে তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন এবং শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামীজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘দেখছিস—এরা কেমন সভ্য! বাঙালী হলে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।’ শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২।১টা; লোকের খুব ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামীজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, ‘একবার নয় দেখে আয়, খুব শীগগীর আসবি কিন্তু।’ শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

আন্দাজ দশ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ কত লোক হবে?

শিষ্য॥ পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসংঘ দেখিয়া বলিলেন, 'বড়জোর তিরিশ হাজার।'

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪টাটার সময় স্বামীজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

৯. স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ৪১-৪৬

৪১

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন; কখনও কখনও কোন কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখনও গাছপালা ফলফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখনও বা চাকরবাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া বলিতেন, ‘আপনি কেন!’ তাহা হইলে স্বামীজী বলিতেন, ‘তা হলই বা। অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!’

ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা ছাগলকে ‘হংসী’ বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে ‘মটরু’ বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর পাইয়া স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের মত দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠদর্শনে নবাগত ব্যক্তির তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে ঐরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক হইয়া বলিত, ‘ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!’ কিছুদিন পরে ‘মটরু’ মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, ‘দেখ, আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে যায়।’

মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ‘কেষ্টা’। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখনও কখনও স্বামীজীকে বলিত, ‘ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; পরে বুড়োবাবা এসে বকে।’ কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, ‘না না, বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না; তুই তাদের দেশের দুটো কথা বল।’ ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখদুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, ‘ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?’ কেষ্টা বলিল, ‘আমরা যে তাদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তাদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে বাপ।’ স্বামীজী বলিলেন, ‘নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রন্ধে দেবে। তা হলে তো খাবি?’ কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে ঐ সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, ‘হাঁরে স্বামী বাপ, তোর এমন জিনিষটা কোথা পেলি? আমরা এমনটা কখনও খাইনি।’ স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ‘তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।’ স্বামীজী যে দরিদ্র নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, ‘এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি!’ অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ

দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? ‘পরহিতায়’ সর্বস্ব-অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখনও কিছু ভোগ হয়নি।। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফট সব বিক্রী করে দিই, এইসব গরীব দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, ‘মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব-চুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না?’ ওদেশে ধর্ম-প্রচার করতে যাওয়ার

আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

দেশের লোকেরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজান ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! এই দেখনা—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে ক্রিশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—‘ছুঁসনে ছুঁসনে।’ দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁংমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁংমার্গের গণ্ডী ভেঙে ফেলে এখনি যাই—‘কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস’ বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছে, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব। ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।

স্বামীজী॥ (সক্ৰোধে) কোন কাজ কঠিন বলে মনে করলে হেথায় আর আসিসনি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে যায়। তোর কাজ হচ্ছে দীনদুঃখীর সেবা করা

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে। তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কাজ করে যাওয়া, পরে সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক-একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শতসহস্র লোক জগতের হিতসাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে, হেথায় এত দিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানব—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী এলোথেলোভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেনঃ

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামীজী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিষ্যকে বলিলেন, ‘পা দুটো একটু টিপে দে।’ শিষ্য অদ্যকার কথাবার্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘আজ যা বলেছি, সে-সব কথা মনে গোঁথে রাখবি। ভুলিসনি যেন।’

৪২

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

আজ শনিবার। সন্ধ্যায় প্রাক্কালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন-ভজন জপ-তপস্যার খুব ঘট। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন—কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী সকলকেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজীর নিদ্রা একপ্রকার

নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে; শেষরাত্রে সকলের ঘুম ভাঙাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজান হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেনঃ

ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভজন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে; ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়।’

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপ ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার ঝুঁশই ছিল না। শশী ৮১ চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ীর গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ান-দাওয়ানর যোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত? স্বামীজী॥ কি করে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা করে যা আসত, তাতেই সব চলে যেত। আজ সুরেশবাবু বলরামবাবু নেই; তাঁরা দুজনে থাকলে এই মঠ দেখে কত আনন্দ করতেন! সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস তো? তিনি এই মঠের এক-রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরানগরের মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবতেন। তাঁর ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিষ্য॥ মহাশয়, শুনিয়েছি—মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না।

স্বামীজী॥ যেতে দিলে তো যাব। যাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয়-পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে

যায় না। তুই যদি কিছু বিষয়-আশয় রেখে যেতে পারিস তো তোর মরবার আগেই দেখতে পারি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত নয়। এরই নাম সংসার!

মঠের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ

খরচপত্রের অনটনের জন্য কখনও কখনও মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠে central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) বলে জানবি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ব্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি! আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি! এ কথা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তোর ভেতরে যদি বস্তু থাকে তো যত circumstances against (অবস্থা প্রতিকূল) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ—আমরা যতটা সহিতে পেরেছি, তত কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হতে আসছে তারা পারবে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ-কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা—মোট ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকল্পে জীবনপাত করতে শিখবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছানা দেখিয়া বাহিরের লোকে কত কি বলে! স্বামীজী॥ বলতে দে না। ঠাট্টা করেও তো এখনকার কথা একবার মনে আনবে! শত্রুভাবে শীগগীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘লোক না পোক’। এ কি বললে, ও কি বললে—তাই শুনে বুঝি চলতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি কখনও বলেন, ‘সব নারায়ণ, দীন-দুঃখী আমার নারায়ণ’ আবার কখনও বলেন, ‘লোক না পোক’— ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না। স্বামীজী॥ সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারায়ণের তো criticize (সমালোচনা) করে না? কই, দীন-দুঃখীরা এসে মঠের খাট-ফাট দেখে তো criticize

(সমালোচনা) করে না। সৎকার্য করে যাব, যারা criticize (সমালোচনা) করবে তাদের দিকে দৃকপাতও করব না—এই sense-এ (অর্থে) ‘লোক না পোক’ কথা বলা হয়েছে। যার ঐরূপ রোক আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারও কারও বা একটু দেৱীতে—এই যা তফাত; কিন্তু হবেই হবে। আমাদের ঐরূপ রোক (জিদ) ছিল, তাই একটু-আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তবে হুঁশ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলিকাতায় একাজ সেকাজ করে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয়! কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেনঃ

ঠিক ঠিক সন্ন্যাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচাল পা পড়লে তো একেবারে পাহাড় থেকে খদে পড়ল—হাত-পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কানাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হল। লোকটাকে বললুম, ‘ওরে ছিলিমটে দিবি?’ সে যেন জড়সড় হয়ে বললে, ‘মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।’ সংস্কার কিনা!—শুনেই পেছিয়ে এসে তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল—তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছি; জাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তখন প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি তখনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, ‘ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।’ তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বললুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে?—অবশেষে তামাক সেজে দিল। তখন আনন্দে ধূমপান করে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা—পরীক্ষা করে আপনাকে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কঠিন! কথায় ও কাজে একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই।

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি কখনও গৃহীর আদর্শ এবং কখনও ত্যাগীর আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ করেন; উহার কোনটি আমাদের মত লোকের

অবলম্বনীয়? স্বামীজী॥ সব শুনে যাবি; তারপর যেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাকবি—bulldog-এর (ডালকুত্তার) মত কামড়ে ধরে পড়ে থাকবি।

বলিতে বলিতে, শিষ্যসহ স্বামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখনও মধ্যে মধ্যে ‘শিব শিব’ বলিতে বলিতে, আবার কখনও বা গুনগুন করিয়া ‘কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী’ ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

৪৩

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

শিষ্য গত রাত্রে স্বামীজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামীজী শিষ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, ‘যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল।’ আদেশমত শিষ্য প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে জপধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামীজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা-বাজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘বাঙালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হল।’ শিষ্যমুখে ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘বেশ করেছিস।’

অতঃপর স্বামীজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামীজীর জন্য পৃথক আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া শিষ্যকে একখানি আসন দেখাইয়া বলিলেন, ‘যা, ঐ আসনে বসে ধ্যান কর।’ মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্বলিতেছে।

স্বামীজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিষ্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামীজী ‘শিব শিব’ বলিয়া ধ্যানোন্মিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু তখন অরুণরাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেনঃ

দেখলি, সাধুরা আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হলে কত কি দেখতে পাওয়া যায়! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার দর্শন পেলে যা দেখতে চাইবি, তাই দেখতে পাওয়া যায়। দৃঢ় গুরুভক্তি থাকলে সাধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা-আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ‘গুরুব্রহ্মা গুরুবিস্বঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।’

অনন্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামীজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেনঃ ভেতরে নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিদ্ধি (সিংহ) রয়েছে, ধ্যান-ধারণা করে তাঁর দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধনভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মস্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে যায়—আত্মদর্শন লাভ হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, শাস্ত্রে ঐ-সব কথা পড়িয়াছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই তো এখনও হইল না। স্বামীজী॥ ‘কালেনাত্মনি বিন্দতি’—সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাকতে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে—সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। ঐভাবে দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। ঐ

তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের সঙ্কল্পবৃত্তি। ইতঃপূর্বে যে-সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছি, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখনও কখনও কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়—তারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে, তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশূন্য নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহূর্মুহঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা করে তাঁকে ঐ-সকল অবস্থা আনতে হত না। আপনা-আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁকে দেখেই তো এ-সব ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা-আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জানতে পাচ্ছি না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান করবার পূর্বে যখন নাড়ী শুদ্ধ করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, ‘জাগো মা, জাগো মা।’ ধীরে ধীরে এ-সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional side-টা (ভাবপ্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটেই বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্ধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকায় বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে অনেকের ভাব হত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। অনুসন্ধানের পরে জানতে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হত। ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, এ-সকল গুহ্য সাধন-রহস্য কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম। স্বামীজী॥ সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে? এগুলি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় চলে আসছে। খুব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে সুগন্ধি ফুল রাখবি, ধুনা জ্বালবি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই করবি। গুরু-ইষ্টের নাম করতে করতে বলবিঃ জীব-জগৎ সকলের মঙ্গল হোক। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ উর্ধ্ব—সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বসবি। এইরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর স্থির হয়ে বসে—যে-কোন মুখে বসলেই হল—মন্ত্র দেবার কালে

যেমনটা বলেছি, সেইরূপ ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবি। কাজের ঝঙ্কাট থাকে তো অন্ততঃ পনের মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি হয়রে বাপ?

এইবার স্বামীজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেনঃ

তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন মুক্তি-ফুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আত্মনাদ-পূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা করে এ দেহ পাত করে ফেলেছি। এই হাড়মাসের খাঁচায় আর যেন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি একটু জিরুই। আর কিছু না পারিস, এইসব যত শাস্ত্র-ফাস্ত্র পড়লি, এর কথা জীবকে শোনাগে। এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

৪৪

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—১৯০২

স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসে প্রধান জিজ্ঞাসু। এরূপ শাস্ত্রালোচনাকে স্বামীজী ‘চর্চা’ শব্দে নির্দেশ করিতেন এবং চর্চা করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন বা উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামীজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামীজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্বদা শিরোধার্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ।

আজ শনিবার। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র শিষ্য জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত

হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা—স্বামীজীর সঙ্গে যায়, কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে—ভাবিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কান-ঢাকা টুপী পরিয়া একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘চল যাবি?’ শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী অন্যমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া কথা কহিয়া তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, স্বামীজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।’ স্বামীজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ॥ কত কি বলতেন তা তোকে একদিনে কি বলব? কখনও বলিতেন, ‘নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।’ কখনও বলতেন, ‘ও আমার স্বশুরঘর।’ আবার কখনও বলতেন, ‘এমনটি জগতে কখনও আসেনি—আসবে না।’ একদিন বলেছিলেন, ‘মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!’ বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভেতর করে ওঁকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষ্য॥ মহাশয়, বাস্তবিকই কখনও কখনও মনে হয়, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু আবার কথাবার্তা বলিবার এবং যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয় যেন কোন আবরণ দিয়া সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিতে দেন না!

প্রেমানন্দ॥ ঠাকুর বলতেন, ‘ও যখনি জানতে পারবে—ও কে, তখনি আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে।’ তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণা করতে দেখলে আমাদের ভয় হয়।

এইবার স্বামীজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ-সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ‘কিরে, তোদের কি কথা হচ্ছিল?’ শিষ্য বলিল, ‘এই ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছিল।’ উত্তর শুনিয়াই স্বামীজী আবার অন্যমনে

পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি তাঁহার বসিবার জন্য পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেনঃ

তোদের দেশে বেদান্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা না কেন? ওখানে ভয়ানক তন্ত্রমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব। অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙাল-দেশটা তোলপাড় করে তোল দেখি, তবে জানব—তুই বেদান্তবাদী। ওদেশে প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে—তাতে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এই সব পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দে। আর বিচার করে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হারিয়ে দে। শুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান—এই নিয়েই হয়তো নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের মাসাবধি বিচার চলেছে! আত্মজ্ঞানলাভের তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা হয় বল? বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন না হলে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক বা নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতেই হোক একটা চতুষ্পাঠী খুলে দে। তাতে এইসব সংশাস্ত্র-পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ঐরূপ করলে তোর নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীর্তিও থাকবে।

শিষ্য॥ মহাশয়, আমি নামঘণ্টার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবে আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরূপ ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, মনের কথা বোধ হয় মনেই থাকিয়া যাইবে।

স্বামীজী॥ বে করেছিস তো কি হয়েছে? মা-বাপ ভাই-বোনকে অন্নবস্ত্র দিয়ে যেমন পালন করছিস, স্ত্রীকেও তেমনি করবি, বস্। ধর্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম-উদযাপনে ‘সহধর্মিণী’ বলে মনে করবি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মত দেখবি। ঐরূপ ভাবতে ভাবতে দেখবি মনের চঞ্চলতা একাবারে মরে যাবে। ভয় কি?

স্বামীজীর অভয়বাণী শুনিয়া শিষ্য আশ্বস্ত হইল।

আহারান্তে স্বামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন। অপর সকলের প্রসাদ পাইবার তখনও সময় হয় নাই। সেজন্য শিষ্য স্বামীজীর পদসেবা করিবার অবসর পাইল। স্বামীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জন্য কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, ‘এই সব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা করে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে।’ পরিপ্রশ্নে ‘সেবয়া’—গীতার উক্তি শুনেছিস তো? এদের সেবা করবি, তা হলেই সব হয়ে যাবে। তোকে এরা কত স্নেহ করে, জানিস তো?’

শিষ্য॥ মহাশয়, ইহাদের কিন্তু বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক একজনের এক এক ভাব!

স্বামীজী॥ ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সঙঘরুপ তোড়াটি বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, ‘যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।’ যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচকে থাকে বলে এদের সামান্য মানুষ বলে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বার হবে, তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ বলে এদের জানবি। আমি এদের ঐ-ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মত spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মত ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কিনা সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্ম-শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামীজী আবার বলিলেন, ‘তোদের দেশ থেকে নাগ-মহাশয় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর দু-একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল, তারা তাঁকে ধরতে পারলে না।’ নাগ-মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, ‘হ্যাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল দিকি।’

শিষ্য॥ আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়েছি মাত্র, চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়েছি, একবার মহাবারুণীযোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ-মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন-চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা নাগ-মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং পিতাকে বলেন, ‘মন শুদ্ধ হলে মা গঙ্গা এখানেই আসবেন।’ পরে যোগের সময় বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল—এইরূপ শুনিয়েছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার বহু পূর্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

স্বামীজী॥ তার আর আশ্চর্য কি? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্য ঐরূপ হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামীজী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

৪৫

স্থান—কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে মঠে

কাল—১৯০২

আজ বিকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্য দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা-আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামীজী॥ একটা দরকারে এসেছিলুম। চল, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না, বেশ নুন-ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামীজী॥ তবে একখানা নৌকা দেখ।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দরদস্তুর চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌঁছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। ‘ওদের সঙ্গে আবার কি দরদস্তুর করছিস?’ বলিয়া স্বামীজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে ‘যা, আট আনাই দেব’ বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পৌঁছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজীকে একা পাইয়া শিষ্য নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল।

গত জন্মোৎসবের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের মহিমা কীর্তন করিয়া শিষ্য যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুই তোর রচিত স্তবে যাদের যাদের নাম করেছিস, কি করে জানলি—তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সান্নিধ্যপাঙ্গ?’

শিষ্য॥ মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি—ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামীজী॥ ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে, কিন্তু সকল ভক্তই তো তাঁর সান্নিধ্যপাঙ্গের ভেতর নয়? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, ‘মা দেখিয়ে দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।’ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার ভক্তদের সম্বন্ধেও ঠাকুর সেদিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাচ শ্রেণী নির্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্তমান, তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামীজী॥ কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখনও হয়েছে?—না হতে পারে? ও-কথা কখনও বিশ্বাস করিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর

অনেকে এখন ‘ঈশ্বরকোটি’ ‘অন্তরঙ্গ’ ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য কিছুই নিতে পারলে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ও-সব কথা ঝাঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর ‘বাদশা’, তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ কখনও কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবনযাপন করতে পারে?

শিষ্য॥ তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন?

স্বামীজী॥ তা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে spirituality (ধর্মানুভূতি)-র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বলতেন, ‘অবতারের সঙ্গে কল্লান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্শ্বদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য করেন বা জগতের ধর্মভাব প্রচার করেন।’ এটা জেনে রাখবি—অবতারের সাক্ষোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা পরার্থে সর্বত্যাগী, যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার মত পরিত্যাগ করে ‘জগদ্ধিতায়’ ‘জীবহিতায়’ জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিষ্যরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আসছেন। কোথায় কবে শুনেছিস—কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না হলে অপরকে কি করে মুক্ত করবে? বেদ-বেদান্ত ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্র দেখতে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—‘যথা পূর্বং তথা পরম্’—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়চার্য ঠাকুরের কৃতি সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মত শূন্যে লীন হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্রস্বরূপ হবে। বুঝলি?

শিষ্য॥ তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছে, সে-সব কি সত্য নয়?

স্বামীজী॥ একেবারে সত্য নয়—বলা যায় না; তবে তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা করছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলেছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেউ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈতন্যদেব ‘নারদীয়া ভক্তি’ প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেউ বলছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি; ও-সব কথায় কান দিবি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখন দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই থেকেই বোঝ—তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন—কোন গেরস্ত সেখানে আছে কিনা। যদি দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী—উদাসীন।

শিষ্য॥ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখতেন?

স্বামীজী॥ তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস না। বুঝেই দেখ না কেন—তাঁর যে-সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত করছে, তারা বড়—না যারা তাঁর সেবা বন্দনা স্মরণ মনন করছে অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমাৰ উর্ধ্বরেতা, যারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্তিমান চলদ্বিগ্রহ, তারা বড়—না যারা মাছির মত একবার ফুলে বসে, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বসছে, তারা বড়? এ-সব নিজেই বুঝে দেখ।

শিষ্য॥ কিন্তু মহাশয়, যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান—আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী॥ তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।

পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, আপনি যে দেশবিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল?’

স্বামীজী॥ কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

শিষ্য॥ আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনতে বড় ভাল লাগে।

স্বামীজী॥ এই তো কত কি দিনরাত শুনছিস। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য॥ মহাশয়, আমরা তো তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায়?

স্বামীজী॥ তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এইসব সাধুদের সঙ্গলাভ তো করেছিস, তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি করে বল? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁদের সেবাবন্দনা করলে কালে তিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখতে পাবি।

শিষ্য॥ আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, সে কথা তো কোন দিন কিছু বলেন না।

স্বামীজী॥ আমার কথা আর কি বলব? দেখছিস তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হব। তাঁর সামনেই কখনও কখনও তাঁকে গালমন্দ করতুম। তিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

‘(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।’ ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামীজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল। গান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী বলিলেন, ‘তোদের বাঙালদেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা-গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।’

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামীজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় বসিলেন। স্বামীজীর গৌরবান্ধি এবং গৈরিকবসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

৪৬

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—জুন (শেষ সপ্তাহ), ১৯০২

আজ ১৩ আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অদ্য সে অফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী বলিলেন, ‘বেশ আছি। শিষ্যের পোষাক

দেখিয়া) তুই কোটপ্যান্ট পরিস, কলার পরিসনি কেন?’ ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘আমার যে-সব কলার আছে, তা থেকে দুটো কলার একে কাল দিস তো।’ সারদানন্দ-স্বামীও স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া স্বামীজীর কাছে আসিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব-লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।

শিষ্য॥ মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামীজী॥ তা কে বারণ করছে? অফিস-অঞ্চলে কার্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক পরবি বৈকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি—সেই কোঁচা-বুলান কামিজ-গায়, চাদর কাঁধে। বুঝলি?

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ তোরা কেবল শার্ট (কামিজ) পরেই এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘাস—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোষাক পরে লোকের বাড়ী যাওয়া ভারি অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। শার্টের উপর কোট না পরলে, ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকতেই দেবে না। পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস্! আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যেসব পোষাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী—এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামীজীকে বলিবে কিনা, ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজী॥ কি ভাবছিস? বলেই ফেল না।

শিষ্য॥ (সলজ্জভাবে) মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া যায়, যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।

শিষ্যের ঐরূপ দীনতা-দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে স্নেহে বলিলেন, ‘খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাকব, তখন তুমি আস। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।’

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামীজী ‘থাক থাক’ বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতমতের বাগবিতণ্ডায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, ‘ওরে আস্তে আস্তে বিচার কর; অমন চীৎকার করলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।’ শিষ্য ঐ কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল—স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির—যেন ‘চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্বে’। স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যবহারিক জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ‘কখন এখানে এলি?’

শিষ্য॥ এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামীজী॥ তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামীজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজীর কাছে বসিল।

স্বামীজী॥ আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য॥ মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামীজী॥ তোকে সব উপায় তো পূর্বেই বলে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল দেখি তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য॥ মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিয়া থাকি, তথাপি আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখনও কখনও আবার মনে হয়—কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামীজী॥ ও সব weakness-এর (দুর্বলতার) চিহ্ন। সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মাদর্শন একবার হলে সব হল—জন্ম-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।

শিষ্য॥ আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলিতে আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন।

স্বামীজী॥ সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুষুम्না-পথে মন যদি একবার চলে যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর করতে হবে না।

শিষ্য॥ আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্য-বস্তু প্রত্যক্ষ হইবে কি? স্বামীজী॥ হবে বৈকি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি? ও-সব weakness (দুর্বলতা) মনেও স্থান দিবিনি।

পরে বলিলেনঃ শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর ‘পরহিতায়’
জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

অতঃপর প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায় বলিলেন, ‘যা প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে।’

শিষ্য স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা করায় স্বামীজী শিষ্যের মস্তকে হাত
দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, ‘আমার আশীর্বাদে যদি তোর কোন উপকার
হয় তো বলছি—ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি
জানি না।’

শিষ্য এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামীজীর
আশীর্বাদের কথা বলিল। স্বামী শিবানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘যাঃ বাঙাল, তোর
সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।’

আহারান্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাল-সকাল
নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শিষ্যকে কার্যানুরোধে
কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সে উপরে
স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, ‘এখনি যাবি?’

শিষ্য॥ আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী॥ আগামী রবিবার আসবি তো?

শিষ্য॥ নিশ্চয়।

স্বামীজী॥ তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে।

শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মত বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানে না যে,
তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থূলশরীরে তাহার এই শেষচহ্ন দেখা। স্বামীজী তাহাকে
প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, ‘রবিবারে আসিস।’ শিষ্যও ‘আসিব’ বলিয়া
নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, ‘ওরে, কলার দুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।’ শিষ্য বলিল, ‘আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব—আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।’

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।